দিনলিপি-শ্রদ্ধাঞ্জলি

রেণুকা গুহ

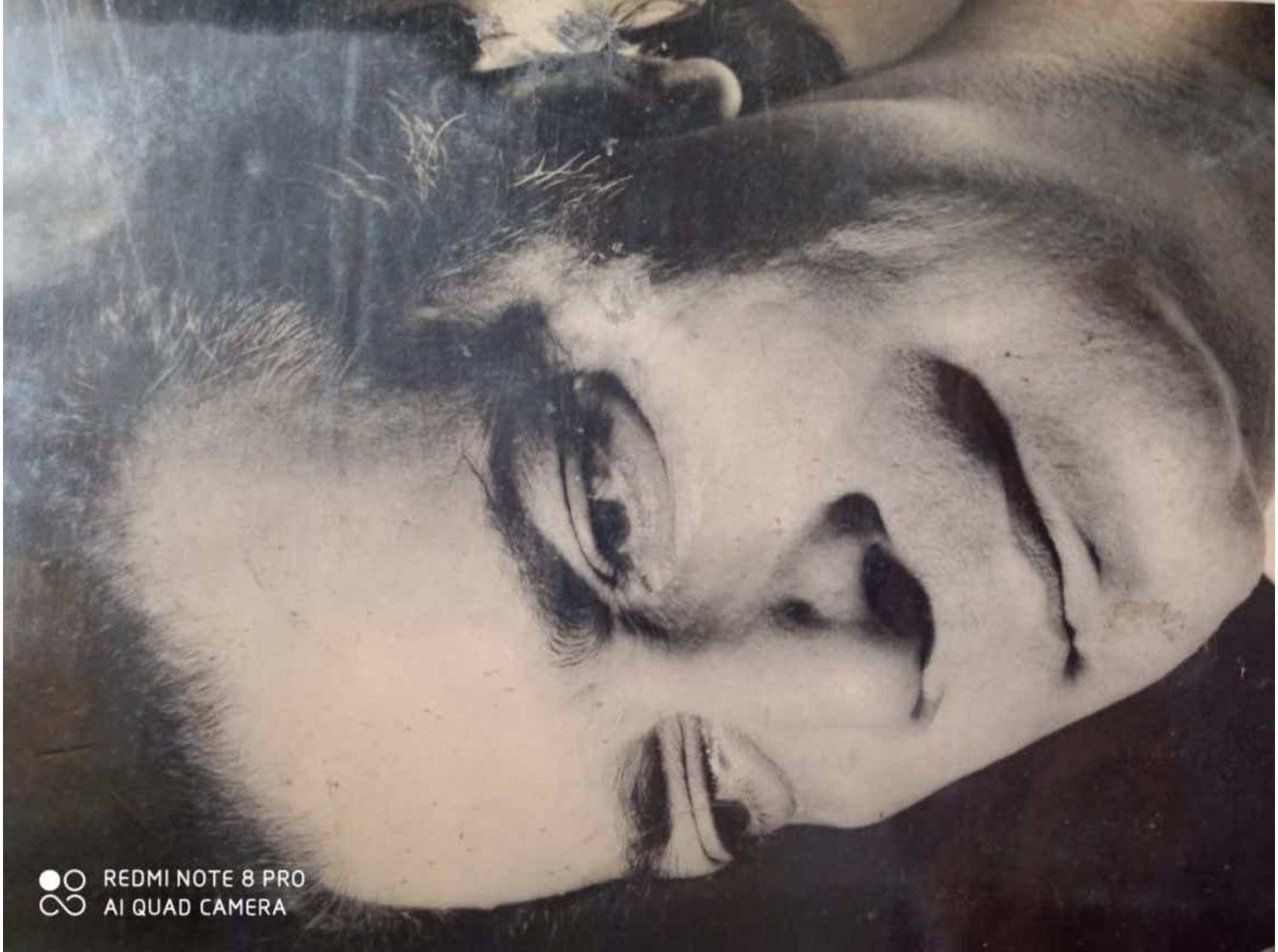
REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

দিনলিপি শ্রদ্ধাঞ্জলি

রেণুকা গুহ

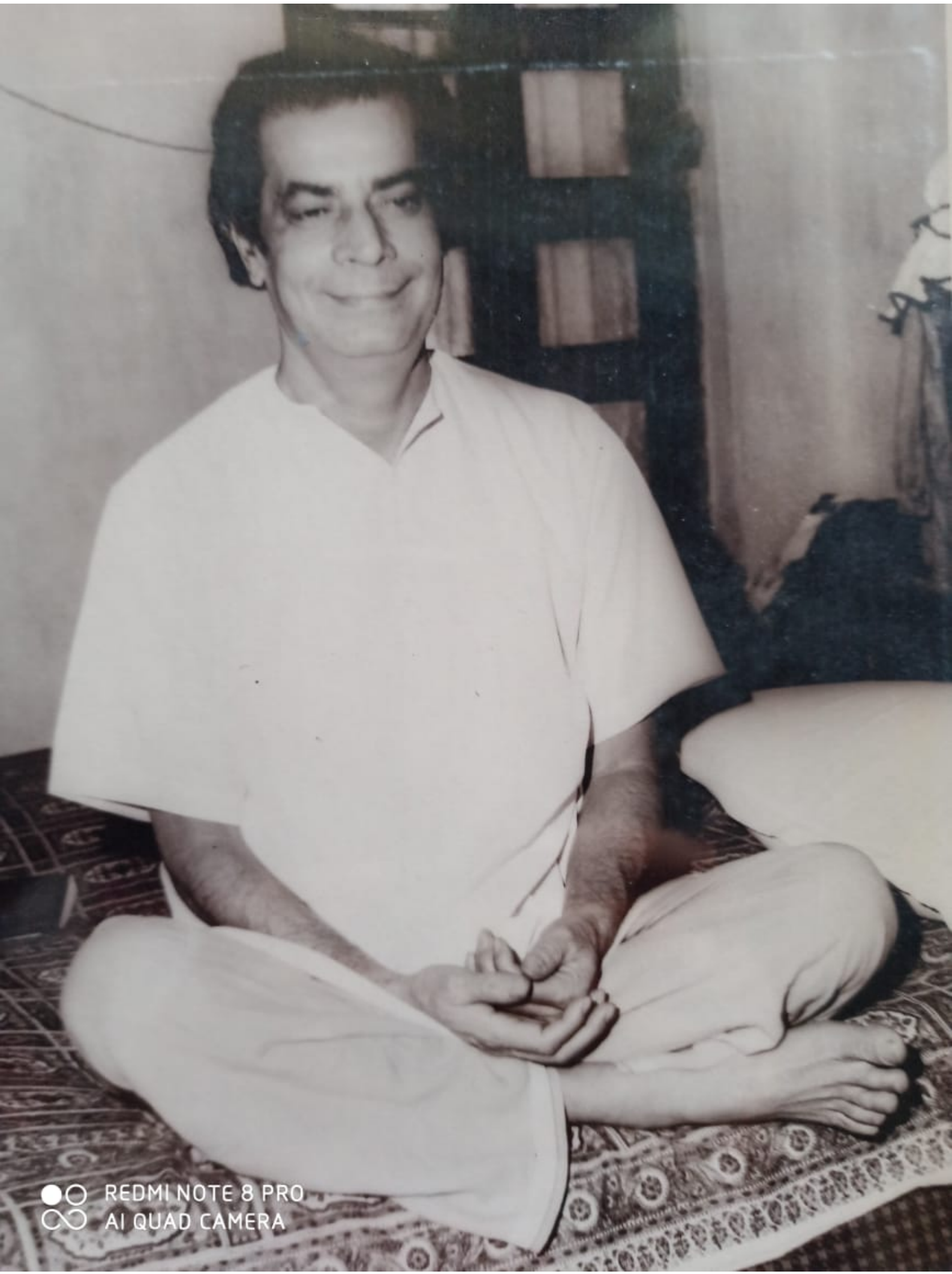
REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

প্রথম প্রকাশ ঃ

মহাষ্টমী, ১লা কার্তিক, ১৩৭৬ সাল

মূল্য ঃ

তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

জিজ্ঞাসা—১৩৩ এ রাসবিহারী এভিন্যু, কলিকাতা-২৯

ফোন নং—৪৭-৭৭৯৫

১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ফোন নং—৩৪-৫৬৭৪

মহেশ লাইব্রেরী—২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী—ডি ৩৪ গণেশ মহল্লা, বারাণসী-১

ডাঃ অনিল মৈত্র—১৭৭-এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

ফোন নং—৪৬-৬১৩৪

প্রকাশক —রেণুকা গুহ।

পি ৭৮২, ব্লক পি,—নিউ আলিপুর, কলিকাত-৫৩

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীভোলানাথ হাজরা

রূপবাণী প্রেস

৩১, বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

দাদার বাণী

তাদের মাতালের স্বামী দাদার। এই পুস্তকে মাধ্যম গীতী। মন কুমুদের প্রতীত যে অনুভূতি হচ্ছে তার মধ্যে স-এই প্রত্যক্ষও সত্য। শেষ সাধারের জীবনে সাত্ত্বিকের মাথা স্থাপিত হিসেবে সেগুলি গোল ফুল হয়। এর্থের সে আলোর প্রকাশ সত্যের মহানাম মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে প্রকাশ হচ্ছে, তার নিদর্শন তার লেখা সবগুলি ভাষার গাঁথা এবং সাম্য সমাদৃত ও যুক্ত হয়েছে। তার লেখা পড়ে জনগণের কল্যাণ হোক এই আশীর্বাদ করি।

দাদা

১০শে ভাদ্র ১৩৭৩

জয় রাম

দাদার আশীর্ব্বাদের বাণীর পিছনে ছোট্ট এক ইতিহাস আছে। সেটি না বল্লে এই মহৎ প্রেরণা অসম্পূর্ণ থাকবে। দাদার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলে, তিনি একদিন সন্ধ্যায় ডাঃ অনিল মৈত্রর গৃহে বসে ভাবঘন পরিস্থিতির মধ্যে আত্মস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে একটি সাদা রুলটানা কাগজ আনতে বল্লেন। তারপর সেই কাগজটি হাতে নিয়ে এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ মৈত্রকে তাঁর আশীর্ব্বাদের খসড়াটি পড়ে যেতে বল্লেন। এদিকে দাদার হাতে রুলটানা কাগজে লাল কালিতে এক অদৃশ্য হাতে আশীর্ব্বাদটি লেখা হয়ে গেল শ্রীরথীন্দ্রনাথ মৈত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। দাদা হেসে কাগজটি হাতে দিয়ে বল্লেন—"ইহাও কিছু নয়, তবে ইহাও হয়।" যাঁর সব কিছু এক আশ্চর্য্য এও তার আর একটি আশ্চর্য্য। আশীর্ব্বাদটি সকলের জন্য বলে আমার বিশ্বাস, তাই সকলকে উপহার দেওয়া হল। এরকম অদৃশ্য লেখা দাদার বহু হয়েছে। বারান্তরে তা লেখার ইচ্ছা রইলো।

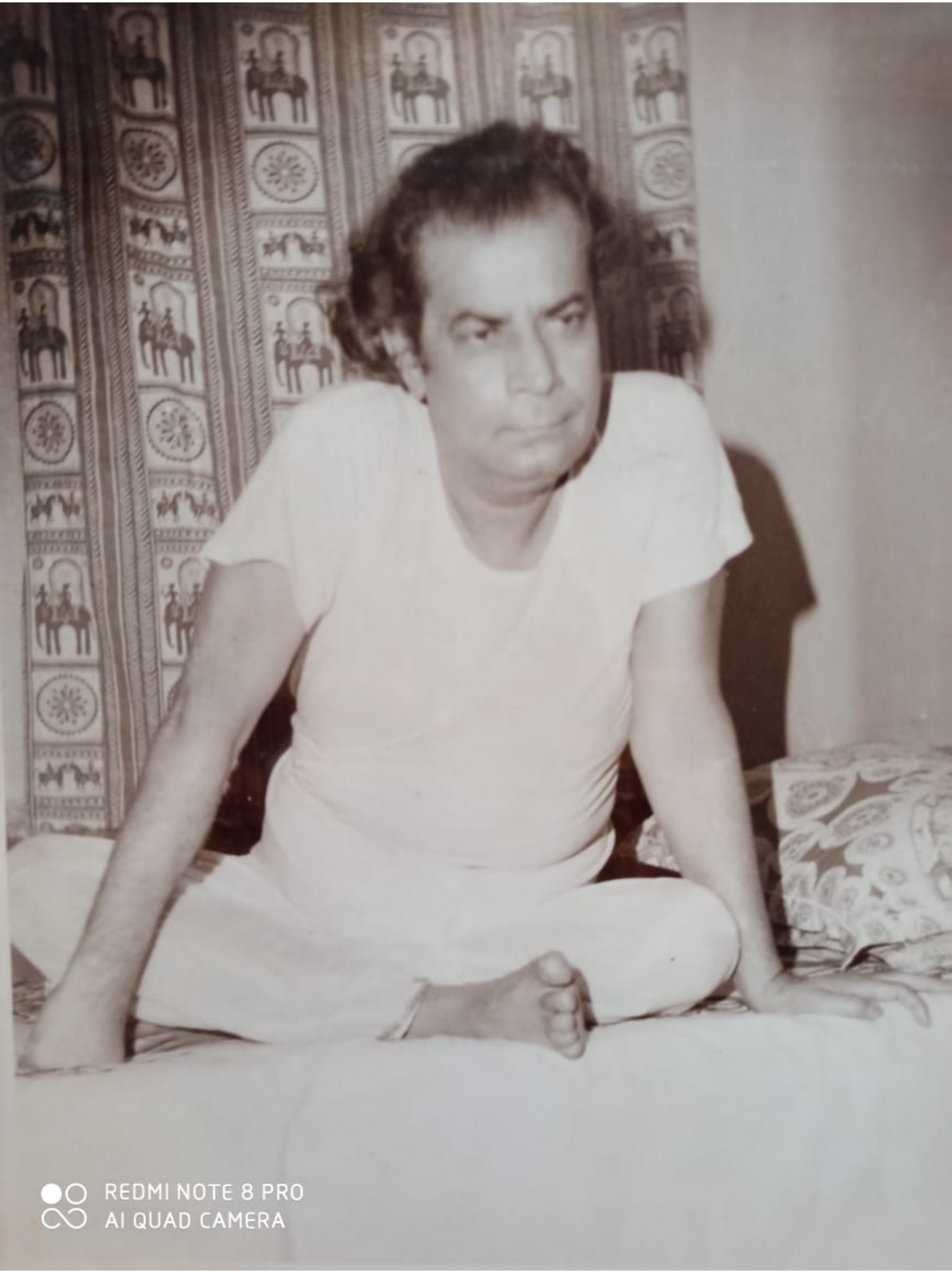
REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

পরম স্নেহময়—"আমাদের দাদা"
শ্রীযুক্ত অমিয় রায় চৌধুরীর
পাদপদ্মেষু।

"দাদা" বলেন—
গুরু কেহ হতে পারে না।
দীক্ষা মন্ত্র কেউ দিতে পারে না—
স্বয়ং "তিনি" ছাড়া॥
তোমরা "যাঁর" কাছ থেকে কৃপা পেয়েছ
আমি স্বয়ং তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।
আমি তোমাদের "গুরু ভাই"
"তোমাদের দাদা"

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

সূচীপত্র

	বিষয়	নাম		পৃষ্ঠা
১।	প্রশস্তি বন্দনা ও 'দাদার' বাণী (কবিতা)	রেণুকা গুহ	....	১
২।	ভূমিকা আমাদের "দাদা" প্রসঙ্গ	বিভূতি সরকার	...	১৩
৩।	নমো সাথী ভগবান (কবিতা)	রেণু মৈত্র	....	২৫
৪।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সাথে "দাদা" প্রসঙ্গ	রথীন্দ্রনাথ মৈত্র (অধাপক গর্ভমেণ্ট আর্ট কলেজ)	....	২৭
৫।	"দাদা" (কবিতা)	অরিন্দম মৈত্র	....	২৯
৬।	"দাদা" বলেন "শিশুমন"	পরিমল চন্দ্র গুহ	....	৩০
৭।	মধু বৃন্দাবন (কবিতা)	অরুণা মৈত্র	...	৩২
৮।	পরম শ্রদ্ধেয় 'দাদাকে প্রথম দর্শনের পরে আমার যে উপলব্ধির অনুভূতি	রেণুকা গুহ	....	১
৯।	আমার দিন লিপি ৮ই মে হইতে ২০শে জুলাই, ১৯৬৯ সাল	রেণুকা গুহ	....	৫
১০।	পরম স্নেহময় দাদার ভক্ত মুখে যা শুনেছি ও শুনিয়েছেন দাদার কৃপা বিভূতি ও অনুভূতি	রেণুকা গুহ	....	৯৫
১১।	আমার প্রার্থনা	রেণুকা গুহ	....	১১৮

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

নবরূপে ধরাধামে এসেছ
নিয়ে নব কলেবর
নহো তো উদাসী তুমি গৃহবাসী
ছেড়েছ পীত পীতাম্বর

কোথায় লুকালে সে রূপ তোমার
শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী,
মদন মোহন মুরতি মনোহর
শ্যামল বঙ্কিমধারী।
বনফুল মালা নাহি দোলে গলে
হাতে নাই তব বাঁশী,
গোপিকাগণ নেই তব সাথে
নেই সে ব্রজের বাসী।
শিখি পাখা শিরে বঙ্কিম ঠারে
নাচিতে কত লয়ে শ্রীরাধিকারে
নুপূরের বোল রুণুঝন বলে
বাজিত পায়েতে হাসি।
যমুনা পুলিনে লয়ে সখীগণে
বাজাতে আপন বাঁশী।

(২)

ঢেকেছ নিজেরে নিজের ছায়ায়,
অপরূপ রূপ অরূপমায়ায়,
মর্ত্যে এসেছ মানবের রূপে

করিতে জীবের ত্রাণ,
তৃষিত তাপিত হৃদয়ে করিতে
শান্তির সুধা দান।

(৩)

প্রেমের ভিখারী, তুমি শ্রীহরি
জীবের প্রেম তরে,
জনম নিয়েছ মানবের ঘরে
গোমতী নদীর তীরে।
শ্যাম তনু দেহ গৌর উজল
হাসি ভরা মুখ নয়ন উছল
আজানুলম্বিত বাহু, যেন যুগবর
চাঁচর কেশের শোভা অতি মনোহর।
অপরূপ জ্যোতি ভাতিছে ললাটে
স্নিগ্ধ প্রদীপ আলোকের মত,
নয়নে লেগেছে আলোর পরশ
পরাণ করিয়া বিমোহিত।

(৪)

মানবের মাঝে সে রূপ হেরিয়া
পুলকিত হইল সব অন্তর,
ভাবিতেছে সবে মর্ত্যে এলো কিগো
মদনমোহন রূপে শ্যাম সুন্দর ?

(৫)

বাল্যের খেলা করি সমাপন,
লভিলে তুমি আলোর চেতন,

বাহির বিশ্বে খুঁজিতে তাঁহারে
করিলে জ্ঞানের সাধন।
জ্ঞানের আলোটি তুলিয়া ধরিয়া
জগৎ প্লাবিয়া বেড়ালে গাহিয়া,
তোমার নূতন আলোকের গান,
পুলকে জাগালে সবার প্রাণ।
কহিলে তুমি সুমধুর স্বরে—

"বৃথা খোঁজ তাঁরে দিগ্ দিগন্তরে
রয়েছেন "তিনি" আপন অন্তরে,
প্রেমের আলোটি জ্বালিয়া
নব অনুরাগে রাঙ্গিয়া।

কোথা তীর্থ! কোথা ধর্ম!
কোথা "ভগবান"
তীর্থ মাঝে আছে শুধু
আত্ম অভিমান।
সর্বতীর্থ মহাতীর্থ,
দেহ তীর্থসার,
সেই তীর্থ মাঝে আছেন
"অনন্ত ঈশ্বর"।

"সচল" ছাড়িয়া কেন কর
অচলের ভজনা?
দেহতীর্থ মাঝে কর
সচলের সাধনা।

গুরু কেহ নাই এ জগতে,
মন্ত্র কেহ দিতে নাহি পারে,
দেহ আছে ভরা, শুধু অহঙ্কারে
বীজমন্ত্র পাইবে আপন অন্তরে।

পূজা, জপ, তপ, সবই অহঙ্কার,
বাহিরে যদি হয় তাঁহার প্রচার,
অন্তরে অতি নিভৃত যতনে
পূজিবে তাঁহারে নিত্য নিয়ন্ত্রণে।

পূজার প্রসাদ তোমারই অন্তর,
নাহি কোন প্রসাদ আর,
নিজেই নিজের প্রসাদ হইলে,
পাইবে তাঁহারে সত্বর।

জগতের মাঝে নাই যাওয়া, আসা,
সবই মিলায়ে যায় শূন্যে,
শূন্যের পরে, সাজায়ে শূন্য
বিরাট অনন্ত শূন্যে।

কোথা যাবে তুমি সংসার ছেড়ে!
থাকিতে হইবে সংসারে,
বন্ধন মাঝে মুক্তি পাইবে
মুক্ত করিবে আপনারে।

(৬)

এ দুনিয়ায় কেহ কারো নহে,
কেহ নহেতো আপন,

সবই যে মায়া, মরীচিকা
সবই যে মিছে স্বপন।

আমার! আমার! আমার—বলিয়া
যতই ফিরিবে পিছে পিছে,
ততই আঘাত পাইবে বিষম
দেখিবে সকল কেবলি মিছে।

যতটুকু কাজ যাহা আছে তব
করিয়া যাইও প্রাণপণে,
ববেকের কাছে নিজেরে সঁপিয়া,
মুক্ত থাকিবে আপন মনে।

"আপন যে জন", আছেন তোমার অন্তরে
শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে,
সাথী তব "তিনি" "তিনি মহাজন"
চির সাথী "যিনি" তিনি "ভগবান"।

(শ্রেষ্ঠ জন্ম) মানুষ জনম লইয়া এসেছ,
করিতে রসের আস্বাদন।
জনম তোমার সার্থক কর
করিয়া আচার আচরণ।

আপনার মাঝে খুঁজিলে "ঈশ্বরে"
পাইবে তুমি তোমার অন্তরে,
ব্যাকুল হৃদয়ে খুঁজিলে "তাঁহারে"
মিলিবে "সত্য সুন্দরে"।

(৮)

মানুষের মাঝে আছেন (সত্য) নারায়ণ,
পূজিবে "তাঁহারে" করিয়া যতন
ঠাকুরের রামরূপে স্থিত নারায়ণ,
"তাঁহারে" কর তুমি আত্ম নিবেদন।

অঙ্গগন্ধ সুবাসে জানিবে "তাঁহারে"
নিশ্চিত আছেন তিনি, "সে" দেহ পরে
শ্রীগৌরাঙ্গেরে জেনেছিল বলে অবতার,
শ্রীনিবাস, ভক্তজনে পেয়ে অঙ্গগন্ধ তাঁর !

নিজের অন্তরে রাখিয়া যতনে
করিবে সুন্দরের আরাধনা।
হৃদয়ের মাঝে একান্তরূপে
করিবে "অমৃতের" সাধনা।

(৯)

মানুষে মানুষে নাই কোন বিভেদ,
নাই কোন মানদণ্ড,
সকলের মাঝে জাগ্রত "একই" দেবতা
তাই তো তিনি অখণ্ড।

মহাবন্ধনে, বন্দিত হয়ে আছি
মোরা সকল জীবগণ,
যে "আমি", সেই "তুমি", সেই "তিনি"
কর্তা তাহার একই জন।

স্মর তাঁরে,—ভজ তাঁরে,
লহ তাঁহার শরণ
এই দেহমন্দিরে বিরাজেন
সেই "মহাজন" ॥

(১০)

তব আহ্বান ওঙ্কার ধ্বনি
উঠেছে গগন ভেদিয়া,
দেশে দশে আজ পড়ে গেছে সাড়া,
তব নবরোলে মাতিয়া।

গুরু কেহ নাই, সবে ভাই, ভাই,
বেঁধেছ মহাবন্ধনে।
মর্তে আনিয়াছ স্বর্গের সুধা
তোমার অমৃত বচনে।

(১১)

বসেছ ধেয়ানে, স্তিমিত লোচনে
কি আছে স্বপন তোমার নয়নে ?
স্তিমিত নয়নে রয়েছ চাহিয়া
অন্তরে সে দৃষ্টি উঠেছে ফুটিয়া।

বহুর মাঝেতে রয়েছ তুমি একা,
আপনার মাঝে, আপনি গেঁথেছ গাথা,
স্মিত হাস্যে, অমৃত দিয়েছ সব জনে,—
তাইতো তোমারে 'আনন্দময়' বলে জানে।

আনন্দ তোমারি ব্রত,
আনন্দ তোমারি ধাম,
আনন্দের মাঝে রয়েছে
জড়ায়ে তোমার নাম।

"ওঠে কলরোল, বাজে নব বোল,
(বলে) কে গো তুমি মহারাজ !'
আনন্দের মাঝে, রয়েছ যে তুমি
তুমিই আনন্দরাজ।

(১২)

ওগো ! দয়াময় ! এসেছ ধরায়
করিতে চেতন দান,
নবরূপে আসি বাজাইলে বাঁশী
হৃদয়ের আঙ্গিনায়।
তুমি গৌরহরি, মোহন মুরারী,
গোপাল গোবিন্দ রাম,
চকিত মন মোহন,
বংশীধ্বনি পরায়ণ
তৃষিত তাপিত শরণ
মদন মূরতি 'শ্যাম'।
অধর মৃদু হাসিত, নয়ন যুগল ভাষিত
তুমি লহ, লহ মোর,
সত্য স্বরূপ আরাম।
অন্তরের অনন্ত প্রণাম।

দেবাদিদেব, তুমি মহাদেব,
তুমি পরম ঈশ্বর।

তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান,
তুমি পরম অন্তর।
তুমি যোগী, তুমি ত্যাগী
তুমি পরম বিস্ময়,
তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি
তুমি সবার সংশয়।

জীবের জীব তুমি,
প্রাণের আরাম
জগতের স্রষ্টা তুমি,
তুমি মনোরম।
মৃত্যুর অভয় তুমি,
দুখী জনের শান্তি,
প্রাণের বন্দনা তুমি
হৃদয় তাপিত তৃপ্তি।
তুমিই জগৎ পিতা,
তুমিই বিধাতা,
তুমি অখণ্ড ব্রহ্ম
তুমিই যুগ দেবতা।

যুগের দেবতা তুমি!
তুমিই যুগ অবতার!
প্রণাম লহ মোর
লহ প্রণাম সবাকার।

—রেণুকা গুহ

গোপাল গোবিন্দ হরি
শ্রীমধুসূদন।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম
শ্রীনরনারায়ণ।
তুমিই মুরলীধারী
শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন,
গোপাল মুকুন্দরূপে
শ্রীযশোদানন্দন।
অপার করুণা তোমার
তুমি অনন্ত নিধান
নবরূপে ধরাধামে—তুমি সত্যনারায়ণ
প্রণাম জানাই তোমায় হে অনন্ত মহান।

বন্দনা মম নব ছন্দে,
ওগো! বন্দিত তব বন্দে
ছন্দে ছন্দে বিলাপ গন্ধে,
সমীরণ বয় মন্দে মন্দে।
আকাশ বাতাস উঠিছে আকুলি
নিলয়ে নিলয়ে পাখীর কাকলি,
কলতান সুর ধরেছে সকলি,
ছন্দে গন্ধে করে কোলাকুলি,
ফুটিয়া উঠেছে, যত ফুলকলি,
শাখে, শাখে, সবে করে বলাবলি,
মাতিছে ধরা একি আনন্দে!
বন্দনা মম নূতন ছন্দে।

বন্দনা মম, সুন্দর তব
নব নব রূপে, করি অনুভব
তোমার প্রকাশে, অরূপ বিকাশে,
অযুত তারা ফুটুক আকাশে,
ছড়ায়ে পড়ুক দিগ্ দিগন্তে—
বন্দনা মম একি আনন্দে।

রেণুকা গুহ।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

ভূমিকা

ওঁ জয়রাম

আমাদের দাদা প্রসঙ্গে

আমরা যাঁর কথা অবতারণা করতে চলেছি তিনি আমাদের সকলের দাদা। তাঁর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবেনা। কারণ দাদার কৈশোর ও যৌবনের বেশ কয়েকবছর অজ্ঞাতবাসে কাটে। তাই তিনি যতক্ষণ না বলছেন তাঁর নিজের সব কথা ততক্ষণ তাঁর পরিচয় ঠিক ঠিক ভাবে কিছু বলা বা লেখা সঙ্গত হবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—

"ভারতের সাধনার ধারা কোন ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেনি।"

"Our religion is based on principles, and not on any person."

তাই দেখা যায়, ভারতের জীবন দর্শনে ও অধ্যাত্মবাদের নানা পথ ও মত ছড়িয়ে আছে ঋষি, মুনি, যোগীদের মধ্য দিয়ে এবং সেই সব তপস্বীর পদধূলিতে ভারত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

অধ্যাত্মবাদ ও তার ধারাটি কোনদিনই সম্প্রদায় বা মঠ আশ্রমের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, এটাই ভারতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

দাদার কথা বলতে গিয়ে তাঁর অপূর্ব রহস্যে ভরা চেহারাটির কথা মনে পড়ে। তাঁর অপরূপ রূপ লাবণ্য ও দেহের গঠনটি এমনি চমৎকার যে লক্ষ লোকের ভীড়ের মধ্য থেকে তাঁকে চেনা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। অতুলনীয় তাঁর চোখ দুটি, কি এক অপার্থিব মায়ায় ভরা। প্রথম

দর্শনেই মনে হয় তিনি যেন কতদিনের পরিচিত, কত চেনা, কত আপনজন। অদ্ভুত এক সঙ্গোপনে হাতছানি দিয়ে দাদা প্রাণের ভেতর এক দোলা দিয়ে দেন চোখের ইঙ্গিতে। আশা নিরাশা, বিরহ মিলনের উর্ধ্বে নিয়ে যান দাদা তাঁর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে। এই চোখ কি ভোলা যায়? দাদা সকলের কাছে ধরা পড়েন এই রহস্যভরা চোখের চাউনিতে। তাঁর দৃষ্টির শুভলগ্নে বুঝিয়ে দেন আমাদের—তোদের ভববন্ধনের বেড়াজাল থেকে অনন্ত মুক্তি নিশ্চয়ই হবে।

কেউ তাঁকে মহামানব বলে মনে করেন, কেউ তাঁকে মহাযোগী বলে ধারণা করেন। কেউ বা বলেন, তিনি আমাদের স্নেহময় দাদা, করুণার অবতার, প্রেমের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ভক্তের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান। তাদের শোকে দুঃখে বুক পেতে দেন বেদনা লাঘব করার জন্য।

দাদার বয়স নিয়েও নানা মতভেদ। কারণ চেহারার সঙ্গে বয়সের মিল খুঁজে পাওয়া যায়না। তাঁর পরিচিত বন্ধুরা যাঁরা তাঁকে বেশ কয়েক বছর ধরে জানেন, তাঁরা এখনও দাদার বয়স অনুমান করতে পারেন না। জরা বার্ধক্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি এখনও। কথাপ্রসঙ্গে দাদা সময় সময় যখন উত্তর ভারতের নানা সাধু সন্তদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা বলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় দাদার বয়স আশিরই কাছাকাছি। তবে এখন তাঁকে দেখায় ৪০।৪২ বৎসরের মত।

সমস্ত উত্তর ভারতের নানাস্থানে দাদা নানা ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। এর কি কারণ দাদা এখনও আমাদের বলেন নি। বন্ধুবর প্রখ্যাত শিল্পী অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং অধ্যাপক বি. ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অণিমা ঘোষ গত এপ্রিল মে মাসে কাশীতে দাদার ছদ্ম নামের কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেন। তাতে জানা যায় দাদা কিছুকাল 'মহাত্মা পাগল বাবা' নামে পরিচিত ছিলেন কাশীতে।

কাশীতে অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ মৈত্র মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে যখন দেখা করেন, তখন দাদার প্রসঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বলেন—তাঁকে কেউ সহজ বুঝতে পারবেনা।

দেখা যায় মহাপ্রভুর ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটেছিল। তাঁর জীবিত কালে তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি, কেবল তাঁর অন্তরঙ্গ কয়েকজন পারিষদ ছাড়া। অবশ্য লৌকিক জগতের জীবনধারার সঙ্গে মহামানবদের জীবনের কোন সঙ্গতি বা মিল থাকে না। সেই জন্য অলৌকিক ঘটনার পরিচয় দিলেও মহামানবকে সাধারণ মানুষ চিনতে বা বুঝতে পারেনা। এই প্রসঙ্গে এই কয়েকটি গানের কলি মনে পড়ে—

"পরিচয় দিতেছি কত আমায় তো কেউ চেনেনা
ভালবাসার কাঙাল আমি আমায় ভালো কেউ বাসেনা" ইত্যাদি।

এই গানটি প্রায়ই শ্রীমতী গীতা মিত্র তার মধুর কণ্ঠে আমাদের শোনান।

আমাদের দাদা মহাপ্রভুর মত নানা অলৌকিক ঘটনা দেখাচ্ছেন প্রতিদিন, নানা ভাবে। মহাপ্রভুর ক্ষেত্রে যেমন তাঁকে কেউ "দেবেশ পরম পুরুষ" বলে জানতে পারেনি, তেমনি দাদার ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা বলে মনে হয়।

ভারতীয় দর্শনের প্রথম দিকে পরম পুরুষকে "ঈশ" বলেছেন, যিনি বিশ্বের স্রষ্টা। ঈশোপনিষদে —"ঈশা বাস্যম ইদং সর্বং যৎ কিং চ জগত্যাং জগৎ"। এই অনুভব আসবে বোধি থেকে। শ্রীমৎ অনির্বাণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন—ঈশের দ্বারা উদ্ভাসিত করতে হবে এই সব, যা কিছু জগতীতে জঙ্গম। ঈশের দ্বারা জগতের সব কিছুকে উদ্ভাসিত দেখতে হবে। তাহাই দৃষ্টির বিশুদ্ধি।

ভারতীয় দর্শনে আরও বলা হয়েছে, ঈশকে কবি এবং তাঁরই সৃষ্ট জগতকে বলা হয়েছে কাব্য। কবি তাঁর কাব্যের রসাস্বাদনের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে।

আমাদের দাদা সেই কাব্যরসের মহাভাবটিকে তুলে ধরেছেন আমাদের মধ্যে। তিনি যেন সেই কবি। দাদা কবির ভাষায় বলেন—"মনুষ্য জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন। মুক্তি, প্রাপ্তি, উদ্ধার সবই তাঁর রসাস্বাদনের অনুভূতিতে হয়। জীবনের এ যুগের চরম লক্ষ্য এটাই। সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেন একমাত্র সেই মহাগুরু, যিনি জীবের অন্তরে বিরাজ করেন।" তিনি আরও বলেন—"মানুষ কোনও দিনও গুরু হতে পারেনা। মানুষ তো কেওড়াতলার আসামী। মানুষরূপী গুরুরও সেই দশা। গুরু কিন্তু চিরন্তন, তিনি তো সঙ্গের সাথী, তাঁকেই চেন, তিনিই তো একমাত্র আপন জন। মানুষের গুরু হওয়া তো অহঙ্কারের কথা। এক অহঙ্কার আর এক অহঙ্কারকে কি পথ দেখাবে? মানুষ কত অসহায় সে কথা যখন সে বুঝবে তখন তার কোন অহঙ্কার থাকবে না। মানুষ গুরু ও কর্তা সাজতে গিয়ে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দেয়"।

দাদা আরও বলেন—"অহঙ্কার যতক্ষণ না নাশ হচ্ছে ততক্ষণ তাঁকে পাওয়া যায় না। মনুষ্যজীবন পেয়ে যদি তাঁকে না ভাবলাম তবে জীবনটাই ব্যর্থ।" "দাদা" বলেন—জটা রেখে গেরুয়া পরে বনে জঙ্গলে গিয়ে তাঁর ভজনা কি করবি? সহজ সরল ভাবেই তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ হন।" বলেই বলেন—"তাঁর ব্যক্তই বা কি আর অব্যক্তই বা কি। তাঁর কাছে দুই-ই সমান। তিনি তো সব হয়েই আছেন। জটা গেরুয়াতে তো অহঙ্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সর্বত্রই তো তিনি রয়েছেন। তাঁকে ভজতে বনে জঙ্গলে যেতে হবে কেন?" 'শ্রেষ্ঠ তীর্থ এই দেহ, দেহটাই তো তপোবন' বলে দাদা নিজের দেহটাকে দেখান এবং অন্য সকলের দেহে হাত দিয়ে যেন কত নির্ভয়ের আশ্বাস দিয়ে বলেন, "এইতো তোদের তপোবন, এর মধ্যে তিনি আছেন। কোথায় যাবি তাঁকে খুজতে?"

দাদা বলেন, অজ্ঞাতবাস কালে তিনি কোন সাধনার জন্য বা

তপস্যার জন্য হিমালয়ে বা কোন তীর্থক্ষেত্রে যাননি। তিনি গিয়েছিলেন সাধু সন্ন্যাসীদের মঠে, আশ্রমে, মোহান্তদের কাছে প্রতিবাদ করতে তথা কথিত গুরুবাদের বিরুদ্ধে।

দাদা বলেন—"গুরুগিরি তো প্রজা পত্তনের ব্যাপার। গুরুগিরি করা কি সাংঘাতিক আচরণ।" এখনও দাদা সেই গুরুবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চলেছেন। সেদিক দিয়ে তিনি এক মহান বিপ্লবী।

দাদার জীবনে তপস্যার বা সাধনার মূল সূত্রটি খুবই রহস্যে ভরা। আমাদের মন বুদ্ধির দ্বারা সে রহস্য ভেদ করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। তবে দাদার সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখে মনে হয়, তাঁর এই অসাধারণ শক্তি বা ক্ষমতা, যা কিছু ভাষা দিয়ে বলার চেষ্টা হোক না কেন, দাদা জন্মের সঙ্গে এসব নিয়েই এসেছেন। কারণ তপস্যা দ্বারা এ শক্তি অর্জন করা সম্ভব নয়।

এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা প্রতিদিন মুহুর্মুহু তিনি দেখান তাতে অভিভূত ও বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। যুক্তি তর্ক দিয়ে এর কোন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাঁর ইচ্ছামাত্রই সকলের চোখের সামনে সব ঘটনাগুলি ঘটছে, কোন ক্রিয়া বা যোগদ্বারা এইগুলি তো হচ্ছে না। এইটাই দাদার আর এক বৈচিত্র্যময় রহস্য।

এ রকমও দেখা যায় শূন্যে দাদা কেবল হাতটি বাড়ান, মুহূর্তে তাঁর হাতে শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের বাঁধান ছবি এলো এবং সেটি বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখার্জীর হাতে দিলেন। এটি ঘটে দাদার ঠাকুর ঘরের মধ্যে। তারপর আমরা দাদার বারান্দায় এসে বসলাম। পরক্ষণে দাদা আবার হাত বাড়িয়ে একটি শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী আনলেন এইভাবে, বইটির ওপর দাদা কেবল হাত বুলিয়ে গেলেন। তাতে দেখা গেলো শ্রীমতী গীতা মুখার্জীর নাম লাল কালিতে লেখা। বিস্মিত কণ্ঠে বিচারপতি মিঃ মুখার্জী বল্লেন—"এ এক অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার। পূর্বে কখনও দেখিনি। অদৃশ্য হাতের লেখাটিও অপূর্য।" এর পর

দাদা বিচারপতি মিঃ মুখার্জীর হাতে শূন্য থেকে একটি বড় আপেল এনে দিলেন। আমাকে একটি অপূর্ব সন্দেশ হাত বাড়িয়ে এনে দিলেন। এইসব প্রতিটি জিনিষের মধ্যে এক আশ্চর্য্য গন্ধ পাওয়া যায়।

দাদা শ্রীশ্রীরামঠাকুরের ছবি কখনও বাঁধান, কখনও বা খোলা অবস্থায় শতশত ভক্তদের মধ্যে দিয়েছেন এইভাবে। শুধু দাদার বাড়ীতে নয়, নানা ভক্তদের বাড়ীতেও এমনকি চলন্ত গাড়ীতে বসেও হাত বাড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পট ও শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী ভক্তদের দিয়ে থাকেন। নানা দেশে বিদেশের ওষুধ শূন্যে হাত রেখে আনেন। নানা ফল ও নানা দেশ বিদেশের জিনিষ অলৌকিকভাবে দেন।

অনেক সময় খালি হরলিক্সের শিশি বন্ধ অবস্থায় মুহূর্তে সুগন্ধি চরণজলে পূর্ণ হয়ে যায় এবং এক অদ্ভুত সৌরভে ঘর ভরে যায়। আবার কখনও কখনও দাদা একজনকে কোন কারণে একটি গাছের পাতা নিয়ে আসতে বলেন এবং সেই পাতাটি মুহূর্তে একটি ওষুধের ফাইলে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

এইরূপ নিত্য কতো নূতন নূতন ঘটনা দাদা আমাদের দেখান। অনেকে দাদার এই ঘটনা দেখাবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে দাদা বলেন—"অবিশ্বাসী মানুষ এত দেখেও ভগবানকে জানতে চায়না, বুঝতেও চায়না! কেন মনুষ্য জীবন পেলাম, সে কথা একবারও ভাবে না। তাই এই সব ঘটনা তাঁরই ইচ্ছায় ঘটে যাতে মানুষের মনে ভগবৎ প্রেরণার উদ্রেক হয়। এতে আমার কোন কর্তৃত্বও নাই, কৃতিত্বও নাই। এতে কোন ক্ষয়ও নাই, লয়ও নাই। তোদের ভাষায় এটা কিন্তু কোন অষ্টসিদ্ধির ব্যাপার নয়। যাকে তোরা বলিস অঘটন সে সব শুধু তাঁর ইচ্ছায়ই ঘটে। এতো দেখেও মানুষের ভগবানের প্রতি বিশ্বাস জন্মায় না। তিনি আরও বলেন—"মন বুদ্ধি দিয়ে এর কোন হদিস পাবি না। তবে মনে রাখিস ইহাও হয়, আবার ইহাও কিছু নয়।"

এমনও দেখা যায় দাদা একই সময় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসে নানা বিষয়ে আলাপ করছেন। তিনি যে একই সময়ে কয়েক জায়গায় উপস্থিত আছেন তার নিদর্শন ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, যখন তিনি অধ্যাপক বি.বি. ঘোষের বাড়ীতে বসে ঘোল খাচ্ছেন, আবার ঠিক সেই সময়ই শ্রীযুক্ত কল্যাণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে বসে চা খাচ্ছেন। আর একদিন আমার অসুখ শুনে আমার বাড়ীতে এসে আমাকে ওষুধ খাওয়াচ্ছেন এবং ঠিক ঐ সময় দাদা ডাক্তার অনিল মৈত্রের বাড়ীতে বসে আছেন। জানা গেলো আর একদিন অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। দাদা নিজের গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছেন ফার্ণ রোডে শ্রীমতী কণা সেনগুপ্তের বাড়ীতে। গাড়ীতে রথীনদা, আমি ও অজিত সেন ছিলাম। গাড়ী চালাতে চালাতে দাদা বললেন—দোকানে এইমাত্র একটি কাঠের ঘোড়া বিক্রা হলো। ১৬৲ টাকায় একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সেটা কিনলো। আমি কিন্তু সেখানে আছি। পরের দিন দোকানে গিয়ে জানা গেলো, গতকাল দাদা ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন যখন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ঘোড়াটি কেনেন।

এই সব ঘটনা সত্যিই এ যুগে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। বুদ্ধি দিয়ে যার কুল কিনারা পাওয়া যায় না। দাদা বলেন—"এই বিশ্বে কোন ফাঁক নাই। There is no gap in the universe. দূরত্ব বলে কোন বস্তু নাই, এর মতে দাদা নিজেকে দেখিয়ে বলেন আমেরিকাই বল আর বিলাতই বল সবটাই তো এক জায়গায়। বস্তু তো এক।" ঘটনাটি একদিন প্রত্যক্ষ করা গেল। অধ্যাপক রথীন মৈত্র কাশীতে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান তাঁর বাড়ীতে। সেই সময় দাদা ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় রায়ের বাড়ীতে বসে আমাদের বল্লেন—"রথীন এইমাত্র কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে ঢুকলো, আর তার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলো। দেখছি রথীন আমার চিঠিটা কবিরাজ মহাশয়ের হাতে দিল। ডাঃ গৌরী নাথ শাস্ত্রী,

অধ্যাপক জগদীশ পালও সেখানে বসে আছেন। সময়টা দেখে রাখ বিভূতি। দূরত্ব বলে কোন জিনিষটাই নাই বুঝছস্।"

রথীনদা কলকাতায় ফিরলে ঘটনাটির কথা আমরা মিলিয়ে নিলাম।

সাধারণ মানুষ এত সব দেখেও তাদের সংশয় ও অবিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারেনা —এটাই বোধহয় আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। অনেককে এ রকমও মন্তব্য করতে শোনা যায়, দাদার কাছে কিছুদিন আসা যাওয়া করার পর হঠাৎ নিজেদের আবিষ্কার করেন যে তাঁরা দাদার সান্নিধ্যে এসে Disillusioned হয়েছিলেন। এবং তাঁরা যেন একটা মস্ত ভুলের পিছনে বিভ্রান্তের মত চলেছিলেন।

দাদার কাছে একমাত্র প্রার্থনা, তিনি যেন এই সব Disillusioned ব্যক্তিদের কৃপা থেকে বঞ্চিত না করেন। তারা নিতান্ত অসহায়, কারণ তাদের মস্ত অহঙ্কারটি তাদের জীবনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দাদা যেমন বলেন,—"দূরত্ব বলে এবিশ্বে কোন বস্তু নাই। তেমনি দাদা আবার দেখান এ জগতে ব্যবধান বা বাধা বলে কিছু নাই। তোরা যে এই ঘরের চারপাশে wall দেখছিস্, দাদা নিজেকে দেখিয়ে বলেন এ কোন wall-ই দেখেনা। wall-এর ওপারে কি আছে এবং হচ্ছে আমি সবই দেখতে পাচ্ছি।"

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবেনা। ঘটনাটি এইরূপ—একদিন সন্ধ্যায় আমি ও রথীনদা দাদার সঙ্গে শ্রীযুক্ত কল্যাণ চক্রবর্তীর Flat-এ যাচ্ছিলাম, দাদা Flat-এর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দরজা খোলার কোন সংকেত না দিয়েই বন্ধ দরজার ভেতর দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন সশরীরে। আমাদের কাছে রেখে গেলেন তাঁর সেই অপূর্ব অঙ্গ গন্ধ। রথীনদা ও আমি অবাক হয়ে গেলাম দাদার এই ভাবে চলে যাওয়া দেখে। এ দিকে মিসেস্ চক্রবর্তীর গলা শোনা গেল, এ কি দাদা এখানে এলেন কি করে? দরজা তো বন্ধ। দাদার

উত্তর শোনা গেল—'একে দরজা বন্ধ করে কি আটকাতে পারিস্? দরজা খুলে দে, বিভূতি ও রথীন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।' আমরা ভিতরে গিয়ে দেখি, দাদা সোফায় বসে সেই ভুবন ভোলানো হাসি হাসছেন। মিসেস চক্রবর্তী বিস্মিত কণ্ঠে আমাদের বললেন—দেখলেন দাদা কি কাণ্ড করলেন। দাদা উত্তরে হেসে বললেন—ইহাও হয়—আবার ইহাও কিছুই নয়, দরজা খোলাই বা কি, আর বন্ধই বা কি। দুই ই সমান। মনে পড়ল একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে—দ্বার খুলে আর রাখব না, তুমি পালিয়ে যাবে গো ইত্যাদি! দাদার ক্ষেত্রে দরজা খোলা বা বন্ধ যখন দুই সমান তখন কি করে তাঁকে ধরে রাখব এটাই যেন তখন আমাদের ভাবনার বিষয় হল। আমাদের চিন্তিত দেখে তিনি হেসে বললেন—ভাবনাটা তোদের এঁর ওপর ছেড়ে দে না, তিনিই সব করবেন।

দাদার এই ভাবে বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে সশরীরে চলে যাবার ঘটনা জানা যায় ডাক্তার অনিল মৈত্র ও ডাক্তার মানস মৈত্রের বাড়ীতে। তারা দাদাকে হঠাৎ ঘরের মধ্যে দেখে বিস্মিত হ'লে দাদা তাদের বললেন—তোদের দাদাকে কি দরজা বন্ধ করে আটকাতে পারিস? মিসেস রেণুকা সান্যালের বাড়ীতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে! এ রকম কত অঘটন দাদা নিত্য দেখিয়ে যাচ্ছেন তা লিখে শেষ করা যায় না। তাঁর বর্ণনা দেওয়াও সবসময় সম্ভব নয়।

কোন উদ্দেশ্যে তিনি এ সব করে চলেছেন তার কারণ তিনিই জানেন শুধু। কারণ তিনি যে অশেষ মঙ্গলময়, অসীম তাঁর কৃপা সকলের প্রতি এইটুকুই তাঁর আচরণে প্রকাশ পায়।

সময় সময় দাদা কোন কোন ভক্তদের বাড়ী শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা করেন শ্রীশ্রীরামঠাকুরের পটের সামনে! এই পূজার পদ্ধতি বড় বিচিত্র। পূজার উপকরণ বিশেষ কিছুই থাকে না। ধূপ ধুনা পর্যন্ত থাকে না। দাদা একাকী দরজা বন্ধ করে পূজায় বসেন। কিছুক্ষণ পরেই ঘরের মধ্য থেকে এক অপূর্ব গন্ধ ভেসে আসে বাতাসে। দাদা

দরজা খুলে দেন পূজা শেষে। ঘরের মধ্যে তখন যেন এক মায়া-জালের সৃষ্টি হয়। অচিন্তনীয় আবেগে দাদা জোড় হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। মনে হয় দাদা যেন তখন এ জগতের মানুষ নন। পূজার ঘরের আসবাব পর্যন্ত এক অপূর্ব গন্ধে ভরে যায়। দাদার অঙ্গ প্রায় সব সময় এক দিব্য গন্ধে ভরে থাকে। বহু দূরেও দাদার সেই অঙ্গ গন্ধ পাওয়া যায় অনেক সময়। দাদা বলেন—"তিনি যে তোদের সঙ্গে থাকেন এইটাই তার প্রমাণ।"

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় বলেন "দাদা প্রকৃতিকে তাঁর আয়ত্তের মধ্যে রেখেছেন। আর মাধ্যাকর্ষণকে সম্পূর্ণরূপে জয় করেছেন। তাই দেখা যায় অলৌকিক বা অঘটন সবই যেন তাঁর ইচ্ছায় ঘটে।" দাদা বলেন, "এর কোন আকর্ষণও নাই বিকর্ষণও নাই!" দাদা বলেন "জাতি ভেদ মানুষেরই সৃষ্টি, জাতি বলতে একটাই জাতি, সেটা মানবজাতি। তারা এক পারবার ভুক্ত।"

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ প্রিয়দারঞ্জন রায় দাদার এই সব অলৌকিক ঘটনা দেখে শুধু বিস্মিত হন নি, তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস হয়েছে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর।

দাদা বলেন "তোরা দৃষ্টি ভঙ্গিটা বদলা, তা হলে তোরা দেখবি সবটাই এক, ভেদ কিছু নাই।"

ভারতীয় দর্শনে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির কথার উল্লেখ আছে। (১) মিথ্যা দৃষ্টি, (২) সম্যক্ দৃষ্টি। দাদা এই মিথ্যা দৃষ্টির প্রভাব থেকে, যাকে যোগমায়ার শক্তি বলা হয়, তার হাত থেকে মুক্ত হতে বলেন।

দাদা আরও বলেন—এক অখণ্ড সৎ বস্তু সমস্ত সত্তার মধ্যে ওতোপ্রোত ভাবে পূর্ণ হয়ে আছে। তিনি তো পূর্ণ, বলে দাদা এই শ্লোকটি বলেন—

ওঁ পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদং পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণম্ আদায় পূর্ণম্ এবা বশিষ্যতে।

শ্রীমৎ অনির্বাণ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন—পূর্ণ ঐ, পূর্ণ এই, পূর্ণ হতে পূর্ণ উপছে পড়ছে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়েও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকছে।' এই পূর্ণের অপূর্ব ভাবটি দাদা তাঁর জীবনের আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কারণ সন্ন্যাস বা ত্যাগ সে তো বিনাশের পথ। যদিও ভারতীয় দর্শনে শূন্যবাদ মতের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। দাদা বলেন 'এই পূর্ণ এক অনন্ত মহাকাশে অখণ্ড প্রাণের স্পন্দনের দোলা দেয়। সেই প্রাণের স্পন্দনই মানুষ তার অতীন্দ্রিয় অনুভুতির মধ্যে দিয়ে পায়।' দাদা সেই অনুভুতির পদ্ধতিটি দেখিয়ে দেন ও বুঝিয়ে দেন।

দাদার আবির্ভাব ধর্ম্মের নামে কুসংস্কার ও অন্ধ ও মূঢ় বিজ্ঞানের থেকে পরিত্রাণের জন্য। বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্য থেকে কুবেরের ধন ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে নিজের সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের লোভ বাড়িয়ে তুলেছে। ত্যাগের ও ভোগের সেখানে সমন্বয় নেই। আর দাদা ভোগ ও ত্যাগের মুল সূত্রের সন্ধান বলে দিচ্ছেন সকলের মধ্যে।

অলৌকিক ঘটনাগুলি এত বাস্তব ও সত্য, সে সব কোন প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না। যা বাস্তব তাকে স্বীকার না করলে সত্যেরই অপলাপ করা হয়।

দাদার আর দু' একটি ঘটনা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো। দাদা একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, তার পরিচয়ও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। যখন তিনি ভাবাবেশে দু চারটি গানের কলি শোনান তখন অপূর্ব তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মুগ্ধ হতে হয়। দাদা অনেক সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে গীতা বেদ পুরাণ থেকে অনর্গল শ্লোক বলে যান। সময় সময় প্রাচীন যুগের ব্রজবুলিও বলেন।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় দাদা কোন শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েন নি, এমন কি তিনি সংস্কৃত ভাষাও জানেন না। যাঁর সমস্ত জীবনটাই এক আশ্চর্য রহস্যে ভরা তাঁর বিষয় কতটুকুই বা আমরা জানতে পারি আর কিই বা লিখতে পারি।

মানব জাতি যখন বিভ্রান্তির পথে চলেছে সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম যখন মানুষের কাছে ভীষণ পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, চারিদিক যখন অকল্যাণ ও ধ্বংসের ছায়ায় পূর্ণ, তখন আমাদের একমাত্র ভরসা তিনিই এই অকল্যাণ ও অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করার নেতৃত্ব নেবেন। যেমন নিয়েছিলেন যুগে যুগে,

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

পরিশেষে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা জনাই আমাদের ভগিনী শ্রীমতা রেণু গুহকে। দাদার বিষয় তিনি যে ভাবে ডায়েরির পাতায় তাঁর অপূর্ব অনুভূতি দিয়ে লিখেছেন সে শুধু এক অমূল্য সম্পদ নয়, সাহিত্য জগতেও উজ্জল তারকার মতো সবাইকে পথ দেখাবে। তিনি আমাদের বিশেষ অনুরোধে তাঁর নিভৃত মনের দাদা প্রসঙ্গে চিন্তার অনুভূতি উপহার দিতে সম্মত হয়েছেন। যদিও এসব তাঁর নিজস্ব সম্পদ তবুও দাদার ভক্তদের কাছে এ সম্পদ তিনি উপহার দিলেন। তিনি কবি, তিনি ধ্যানী। ধ্যানলব্ধ বিচিত্র অনুভূতি তাঁর অহরহ হ'চ্ছে। তার লেখা ও কবিতার মধ্যে দিয়ে সে অনুভূতি তিনি কিছু কিছু প্রকাশ করেছেন। তিনি দাদার পরম স্নেহের পাত্রী।

—বিভূতি সরকার।

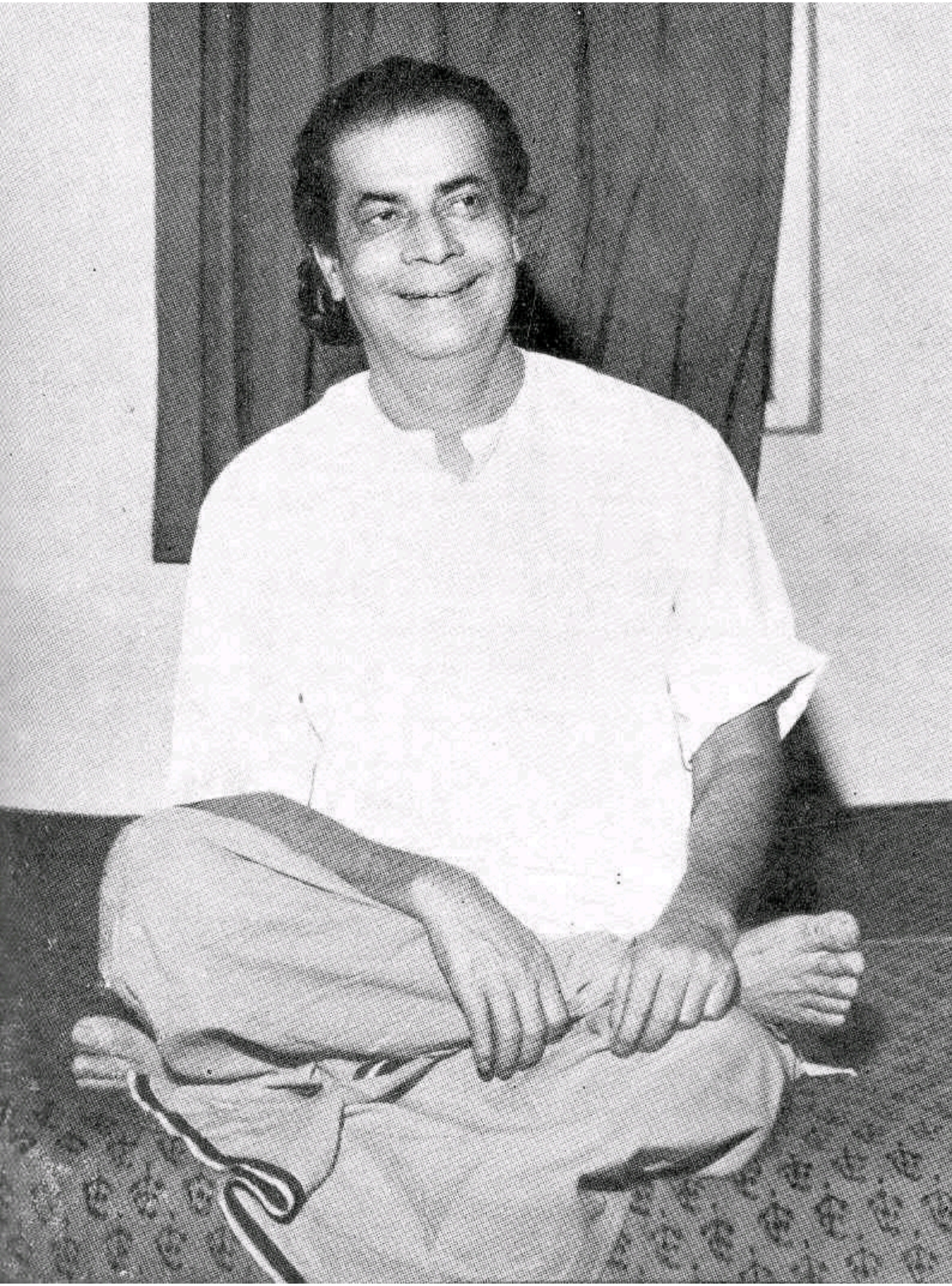

"নমো-সাথী ভগবান"

তোমায় যেদিন আমি দেখিনু প্রথম,
জ্যোতির্ময় দেহধারী, ওগো ভগবান,
মনে হ'লো তুমি মোর কত আপনার,
কত জনমের যেন সাধনার ধন।
স্বরগের দেব তুমি, এসেছো ধরায়,
পরম পুরুষ তুমি, সত্যনারায়ণ,
প্রকাশ হয়েছো তুমি নিজ মহিমায়,
তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ।
অঙ্গের সুবাসে তব, মন যায় ভরি
নন্দন-কানন যেন এসেছে হেথায়,
পারিজাত-ফুল তব চরণে লুটায়ে,
হৃদয়ের প্রীতি দিয়ে প্রণতি জানায়।
এগৃহ হ'য়েছে আজি মধুবৃন্দাবন,
নুপূরের ধ্বনি শুনি তব আগমনে
সার্থক হ'য়েছে মোর সকল কামনা,
আনন্দের ধারা যেন এলো এ জীবনে।
তোমার বর্ণনা বলো কেবা দিতে পারে,
তুমি শুদ্ধ, তুমি সত্য, তুমি সনাতন,
ব্রজের বাঁশরী শুনি হৃদি-বৃন্দাবনে,
হৃদয় আকুল হ'য়ে ওঠে অকারণ।
আজি কি পড়েছে মনে গোপাল আমার,
কত ছানা, ক্ষীর, ননী দিয়েছি তোমায়,
কত খুসীমনে তুমি করেছো গ্রহণ,
অপার আনন্দ তুমি দিয়েছো আমায়।

আমার কাছেতে এলে শিশুমূর্তি ধরি
সযতনে তোমারেই করেছি বরণ,
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড যাঁর বিশ্বরূপে ভরা,
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড যাঁর চরণে শরণ।
আমার জীবনে তুমি ধ্রুবতারাসম,
জেগে থাকো চিরদিন এ প্রার্থনা মোর,
গোপাল গোবিন্দ হরি কৃষ্ণনাম যেন,
স্মরণ করিতে পারি এ জীবন ভোর।

—রেণু মৈত্র

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সাথে "দাদা" প্রসঙ্গ।

গত এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ব্যাপারে কাশীতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

আমি সেই সুযোগে—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা কোরবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম যদিও সে সময় কবিরাজ মহাশয়ের সদ্য পত্নীবিয়োগ হয়েছিল, তথাপি আমার তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনার কিছু অসুবিধা হয়নি।

ঘরে তখন পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও শ্রীজগদীশ পাল (অধ্যাপক) উপস্থিত ছিলেন। আমার প্রধান আলোচনা "দাদাকে" নিয়ে। তারপর অবশ্য আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল সম্বন্ধেও হয়েছিল।

"দাদার" সঙ্গে শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের পরিচয় অনেক দিনের। দেখলাম তাঁকে 'পাগল ছেলে' বলে প্রচুর স্নেহ ও ভক্তি করেন। 'দাদার' দেওয়া চিঠি তাঁকে দিলাম। অনেকক্ষণ ধরে যত্ন সহকারে চিঠিটা বার বার পড়লেন। আমাকে 'দাদার' সাথে পরিচয় কত দিনের জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বল্লাম প্রায় মাস ছয়েক। তবে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে সঙ্গ লাভের সুযোগ হয়েছে। এই কয়েক দিনের মধ্যেই দাদার সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা কতগুলি অলৌকিক ঘটনার দ্বারা কবিরাজ মহাশয়কে ব্যক্ত কোরলাম। শুনে কবিরাজ মহাশয় একটু চিন্তা করে বল্লেন "আমি তাঁকে ভাল ভাবেই চিনি, তবে এত শীঘ্র প্রকাশ হবার কথা আমার সঙ্গে তাঁর ছিল না। অন্ততঃ আরও তিন চার বছর বাদে সে রকম কথা ছিল তবে নিশ্চয়ই এর কোন গূঢ় রহস্য রয়েছে। তাঁকে সহজে কেউ বুঝতে পারবে না।"

আর একটি কথা বল্লেন "দাদা" সম্বন্ধে, সেটার তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারলাম না!

কবিরাজ—মহাশয় বলতে লাগলেন দাদার সম্বন্ধে সেটা হচ্ছে "অধঃবিন্দু, মাধ্যবিন্দু ও উর্ধ্ববিন্দু পাগলা বাবার ক্ষেত্রে সব সমান হয়ে এক হয়ে গিয়েছে ফলে "মাধ্যাকর্ষণের" প্রভাব একেবারেই মুক্ত। এ ছাড়া দাদার সঙ্গে তিনি খুব ঘনিষ্ঠ, সেটা স্পষ্ট কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম।

এ প্রসঙ্গে ঐখানেই জানতে পারলাম 'দাদা' কাশীতে 'পাগলা বাবা' বলে পরিচিত ছিলেন এক সময়ে।

—রথীন্দ্র মৈত্র

"দাদা"

মোদের গৃহেতে দাদা,
আসেন দু'বেলা।
রোদ নিয়ে, বৃষ্টি নিয়ে
করেন যে খেলা
কত ভালবাসে দাদা,
আমারে সে জানি।
স্নেহ পেয়ে ভরে যায়,
মোর বুকখানি।
দাদা যে গো ভগবান,
দেখে মনে হয়।
আমি যেন চিরদিন
গাহি তাঁর জয়।

—অরিন্দম মৈত্র

(ডাঃ অনিল মৈত্রের সাত বছরের ছেলে 'আনন্দ')

শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের মন নিয়ে থাকতে পারলে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে, অনেক সংশয় কেটে গিয়ে, এগিয়ে যাবার পথ সুগম হয়।

পরিণত বয়সে অভিজ্ঞতার সম্পদে মনকে অনুশীলন করে, পরীক্ষণ নিরীক্ষণ দ্বারা মন অনেক দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু তারুণ্যের সুস্থ আবেগে, আলোর সন্ধানে, চিত্তের অনুভূতিকে একাগ্র ক'রে তোলে। ধর্মেই হোক, কর্মেই হোক নূতন ভাবধারাকে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ করতে তাহারা সহজেই অনুপ্রাণিত হয়!

চিরদিনের স্বাভাবিক নিয়মে তারুণ্যের এই অবিমিশ্র আবেগময় গতিবেগ প্রতিদিনের নবারুণে আলোকিত। চলার পথ বন্ধুর হলেও নব নব ভাবধারায় সুগম, আগামী দিনের জীবনে তাহারা আকৃষ্ট।

কালের স্রোতে যাহারা এগিয়ে গেছেন, তাহারা নিজেদের ফেলে আসা জীবন ভুলে গিয়ে ভাবেন যা কিছু সুন্দর, সুষ্ঠু ও শ্রেষ্ঠ তাহাদের সেই সময়কার জীবনকালেই ছিল। কিন্তু প্রানচেতনা তো কখনও মলিন হ'তে পারে না! জাগ্রত আশার আলোতে নৈরাশ্যের স্থান নেই।

আমাদের ধর্ম যাহা অনাদি, অনন্তকাল হ'তে মানবধর্মরূপে প্রবাহিত, সমগ্র কর্ম ও চিন্তা সাবলীল স্রোতস্বিনীতে অবগাহিত, প্রাণ, মন ও হৃদয় শুদ্ধ ও মুক্ত। সামান্য ইঙ্গিতে তরুণেরা সেই গভীরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ও অনাগত কালের জীবনকে সুসংবদ্ধভাবে পরিচালিত করে আপন আপন আদর্শে, সেই একই লক্ষ্যে উপনীত হয়ে নিজ নিজ জীবন সার্থক করে ধন্য হতে পারে সেই ঈশ্বরের উপলব্ধিতে, যিনি সদা কল্যাণ ও করুণাময়।

দিকে দিকে মনকে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ না করে সর্বশাস্ত্র সার ও সর্বকালের চিন্তা নায়কের মননশীল নির্যাস দিয়ে দাদা বোঝাতে চান সকলকে, নর নারী নির্বিশেষে—"ঈশ্বর" অন্তর্যামীরূপে সকলের মধ্যেই বিরাজমান অফুরন্ত শক্তিরূপে ও সত্যসুন্দরের বহুরূপের অভিব্যক্তি নিয়ে। আবিলতা শূন্য শিশুমনেই তাঁর আসন ও আধার আপন লীলাময় ছন্দে প্রকাশ।

"দাদার" মত এমন একজন "আপনজন" কাছে থাকলে প্রতিদিনের জীবন পথ আনন্দে ভ'রে ওঠে। দাদা অবশ্য বোঝান "আপনজন" অর্থে ভগবানকে যিনি সদাই ঘিরে আছেন প্রতিটি জীবন।

—পরিমলচন্দ্র গুহ।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

"মধু-বৃন্দাবন"

ছোড়দির গৃহখানি আনন্দের মধুবৃন্দাবন,
মধুগন্ধে ভ'রে থাকে হেথাকার দখিনাপবন।
মধুঋতু বসন্তের সবগান হেথায় ছড়ানো,
মধুবসনের হাসি আছে যেন সবেতে জড়ানো।
মধুমেলা বসে হেথা প্রত্যহই যাঁর আগমনে,
মধুচক্র গড়ে ওঠে দুইবেলা এ পুণ্য ভবনে।
সকল মধুর উৎস তিনি যে স্বয়ং নারায়ণ,
গোপাল গোবিন্দ হরি তিনি যে গো শ্রীমধুসূদন।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হাতে নাই, তবু মধুময়,
মধুর হাসিটি দিয়ে যিনি সদা দেন বরাভয়।
মধুপ্রীতি জানালেন সবারেই অতি স্নেহভরে,
মধুর সে কৃষ্ণনাম বিলালেন প্রতিটি অন্তরে।
মধুছন্দে সে নাম যে ঝঙ্কারিছে সব মনে প্রাণে,
হৃদয় হ'য়েছে পূর্ণ সবাকার মধু নামগানে।
এগৃহ হ'য়েছে ধন্য তাঁর মধুলীলার বিকাশে,
অঙ্গের সুরভি সাথে মধুর সে স্বরূপ প্রকাশে।
অক্ষয় হইয়া থাক্ হেথাকার এ মধু উৎসব,
আনন্দে ভরিয়া থাক্ মিলনের মধুকলরব।
অক্ষয় হউক হেথা দেবতার মধু আগমন,
এ মধুস্মৃতির-মালা এ হৃদয়ে হোক চিরন্তন।

—অরুণা মৈত্র

———

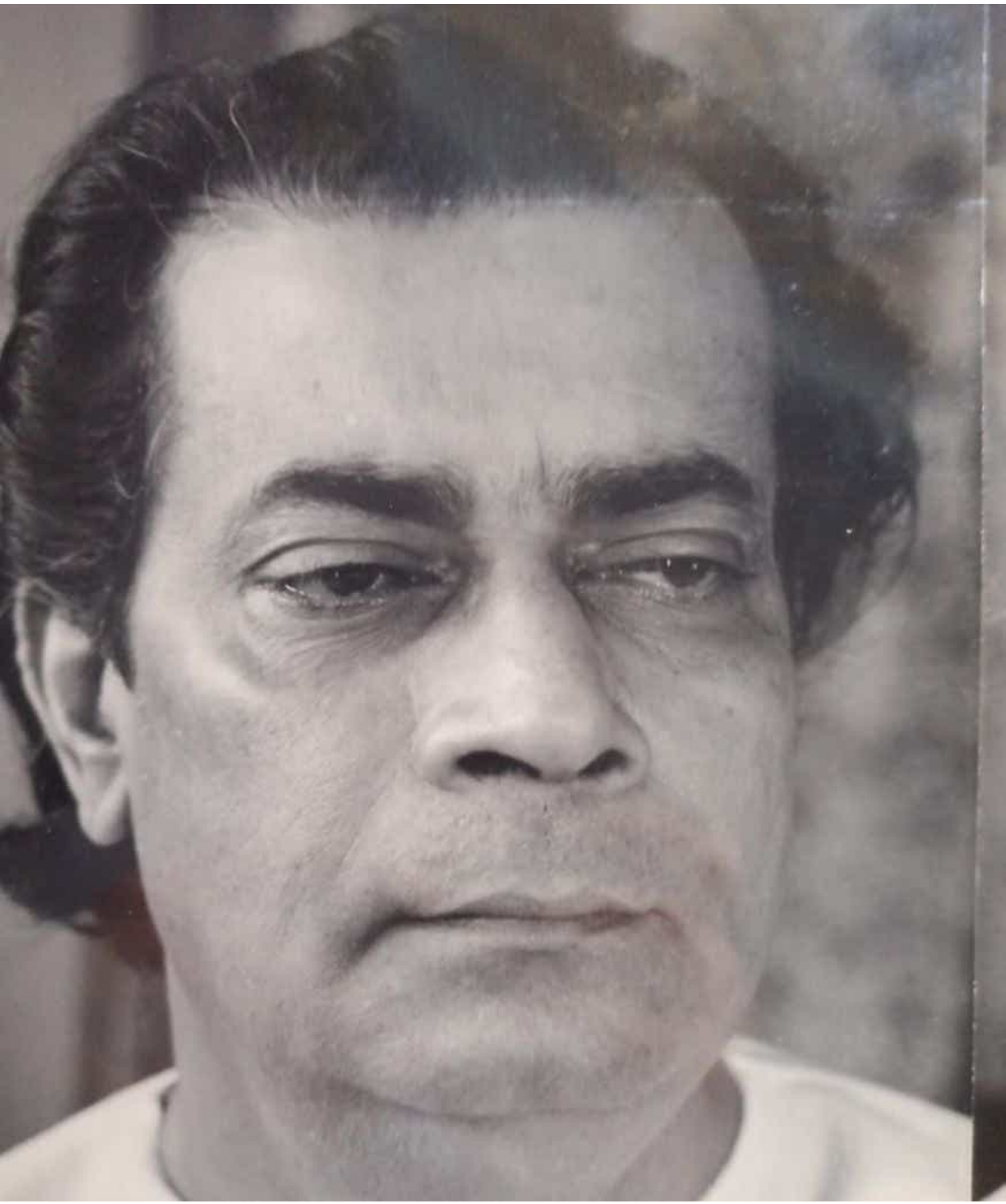

[পরম শ্রদ্ধেয় "দাদাকে" প্রথম দর্শনের পরে আমার মনের উপলব্ধির অনুভূতি]

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা অন্তে আমাদের পরম স্নেহময় 'দাদার' রূপ ঘন সন্নিবিষ্ট, দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত মূর্তি দর্শনে, পরম শ্রদ্ধেয় "দাদার" যোগাশীর্বাদে মহাভাবে আচ্ছন্ন হয়ে অন্তরের নিভৃতে যে একান্ত নিজস্ব উপলব্ধি আমি অনুভব করেছিলাম কল্যাণময় "দাদার" আদেশে তা প্রকাশ কোরছি! অসীম শক্তিময়ের অনন্তরূপে জগৎ পারাবারে প্রকৃতির মাঝে, প্রকৃতির খেলায় মগ্ন, মহামানবের রূপ উপলব্ধির অনুভূতি—

হে মহাপুরুষ! হে পরমযোগী! গুরুর গুরু মহাগুরু তুমি, হৃদয়ের গভীর অন্তরে ধ্যানরূপে মগ্ন, তোমার মহাসত্তা তোমাতেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। নিস্তরঙ্গ তরঙ্গের আঘাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে অনন্ত জলরাশি, প্রবাহিত হচ্ছে তোমারই আপন সত্তাতে।

ধ্যান গম্ভীর সুন্দর সত্তাতে তুমি আপনি আপনে বিরাজমান!

কে তুমি তাতো জানিনা, আপন খেলায় আপনি মেতে রয়েছ ছোট্ট শিশুর আনন্দে, নিজের আনন্দে নিজেই পরিপূর্ণ। জীবনের পরমসত্তা মহানন্দে স্বর্গের সুষমা আহরণ করে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল একসাথে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছ এককের মধ্যে। হে পরম পুরুষ! কোথায় দেখেছি তোমায়? জীবনের কোন্ মহালগ্নে, কোন্ পরম শুভক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিলে আমার সামনে?

না পেয়েছিলাম কি তোমায় ব্যাকুল মনের কন্দরে কন্দরে "শুভ আশীর্বাদের" মতন, লুকিয়েছিলে কি আমার মনের গোপন কোণে?

ব্যাকুল অন্তরে বারে বারে ডেকে কি ছিলাম তোমায় অসহ্য অনুভূতির মাঝে ব্যাকুল বাসনায় ?

হে মহাযোগী ! কে তুমি ? তুমি কি পরম আত্মার আত্মীয়, প্রাণের স্পন্দন, মনের গতি, জীবনের গান ?

কে তুমি ? তুমি কি পরমসত্তার পরম সংশয়, না মনের গোপন ব্যাকুল বাসনা, কিম্বা আত্মার আত্মায় প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো ? কে তুমি ?

তুমি কি জীবনের পরম দেবতা, খেলাচ্ছলে জীবনের পরম আত্মীয়রূপে এক হয়ে মিলে মিশে যাচ্ছো পরম সত্তায়, বেঁধে দিচ্ছো অখণ্ড বন্ধনে ? জানিয়ে দিচ্ছো "যে তুমি সেই আমি, সেই তিনি" ।

দেখেছি "তোমায়" জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গগনের অন্তস্থলে ঐশ্বর্য-ময়ীরূপে ।

দেখেছি তোমায় আমানিশার অন্ধকারে স্থির বিজলীর চমকের মতন ! তটিনীর তরঙ্গ তরঙ্গ দোলায় হিল্লোলিত জীবন প্রবাহে, হাওয়ায় হাওয়ায়, গানের সুরে জীবনে পরমলগ্নে পরম আত্মীয়ের মতন পাশে এসে দাঁড়িয়েছ "তুমি" । নিদ্রার মাঝে সুপ্তির স্বপন হয়ে দেখা দাও "তুমি" ।

সংসারের অস্থিরতার মাঝে তুমি স্থির ও অবিচল । মৃত্যুর মহালগ্নে তুমিই চির সান্ত্বনা । হৃদয়ের গভীরে তুমিই ব্যাকুলতা, বর্ষণ মুখর স্রোতে তুমিই যে বারিধারা । আকাশের নীলাচলে তুমিই রাতের ধ্রুবতারা । সূর্যের প্রখর তেজে তুমিই তেজস্বিতা । জীবনের বিভীষিকা মাঝে "তুমিই" চির আশ্রয়, পরম অভয়, অনন্ত শান্তি ।

চিনেছি তোমায়, জেনেছি তোমায়, হে পরম পুরুষ ! হে মহাযোগী ! যুগ যুগান্তরের পরম আত্মীয় সবাকার ।

তুমি ব্রহ্ম, চির সত্য, অনন্ত অন্তময় । মাতৃরূপে, পিতৃরূপে, আত্মার আত্মীয়রূপে তুমি বিরাজমান ।

প্রেমানন্দে, ভক্তি আনন্দে, কল্যাণময় রূপে সবারই অন্তরে বিরাজ করছো মহানন্দে।

তোমার সচ্চিদানন্দের আনন্দ জোয়ার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাও সবাইকে। ভরপূর করে দাও সবার হৃদয় আনন্দ সুবাসে—তোমারই কল্যাণ পরশে। গুরুর গুরু মহাগুরু তোমাকে জানাই আমার অন্তরের অনন্ত প্রণাম।

বিভূতিযুক্ত কল্যাণময় দাদার সুগন্ধ সুবাসিত পূজার স্বর্গীয় পরিবেশ, মনোময় জগতে স্বর্গরাজ্যের কথাই মনে পড়িয়ে দেয় ভক্তিভাজন দাদার অঙ্গগন্ধের বিভিন্ন রকমের সুবাস ও আতর গন্ধযুক্ত স্বর্গীয় চরণজল এই পার্থিব জগতে যে স্বর্গীয় রাজ্যের পরিবেশ হতে পারে "দাদার" সংস্পর্শে এলে সেই কথাই বারবার মনে পড়িয়ে দেয়। আবার কখনও দেখেছি শ্রদ্ধেয় দাদার প্রকৃতির সাথে আপন ভাবে বিভোর হয়ে খেলা কোরবার ভঙ্গী। হাতের ইসারায়, অঙ্গুলীহেলনে ইচ্ছামতন প্রকৃতির (ঝড়, বৃষ্টি, সূর্যদেব) সাথে খেলা করে চলেছেন। কখনও জাগিয়ে দিচ্ছেন তাদের, আবার কখনও দিচ্ছেন স্তিমিত শান্ত করে। মনে হয় "খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট এ শিশুর আনমনে"। সূক্ষ্ম ও বিভিন্ন দেহে বিচরণ "যথা ইচ্ছা তথা গমন" 'দাদার' এক অপূর্ব খেলা। দাদার সঙ্গের সাথী হলে সব সময়ই অনুভব করা যায় —এই পার্থিব জগতেও যে স্বর্গরাজ্যের পরিবেশ হ'তে পারে মহাযোগী মহাপুরুষ দাদার সংস্পর্শে এলে বারবার সেই কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। মেঘাচ্ছন্ন মনের গভীর দ্বারে এসে আঘাত করে—কে তুমি ? তুমি কে গো ! নিরন্তর এই প্রশ্নই ঘুরে ফিরে বারবার মনের দ্বারে এসে আঘাত দিচ্ছে—মনের আকুল বাসনা, পরম গোপন কামনা, সংশয়ভরা মনকে সংশয়ের কালো ছায়ায় বার বারই ঢেকে দিতে চাচ্ছে অবুঝ অবোধ মনকে—জানা না জানার সন্ধিক্ষণে মনের এই বিচিত্র খেলা নিয়ে মেতে রয়েছি—তাঁরই দিকে। জানা অজানা সংশয়ের পার করে

দাও প্রভু ! অন্তরের অসহ্য ব্যাকুলতা দিয়ে ঘিরে রেখে দাও আমায়। সেই ব্যাকুলতাই যেন তোমাকে চিনবার, তোমাকে জানবার তোমাকে একান্ত করে পাবার, "পরম রসময়" রসে স্বাদ আস্বাদন কোরবার পথ খুঁজে পায়। জানিয়ে দেয় কে 'তুমি'।

তুমি কি আমার মনের ব্যাকুলতা জানতে পেরেছিলে ? পরম আত্মার আত্মায় তুমি ! তাই কি তুমি জানিয়ে দিলে, চিনিয়ে দিলে কে তুমি—তড়িৎ চকিত চমকের মতন পরম সংশয়ের ছায়া এক মুহূর্তে দূরে ঠেলে দিয়ে।

পরম আত্মার আত্মায় তুমি, পরম লগ্নের মহালগ্ন তুমি, জীবনের পরম সত্তায় অখণ্ড অরূপ তুমি, আপনার মাঝে আপনি বিরাজমান।

তুমিই সেই অখণ্ড একক ব্রহ্মাণ্ড। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মহারূপে মহাযোগী, জীবনের পরমসত্তায় মহা আনন্দরূপে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছো মানবের পরম সত্তায়, বেঁধে দিচ্ছো মহা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে।

বেঁধে দিয়েছো একই যোগসূত্রে তোমার সাথে সবাকার মন।

তুমিই যে স্থিত অবস্থায় যুগ যুগান্তরে আমাদের জন্মজন্মান্তরের "দাদাভাই, গোপাল, মধুসূদন দাদা।"

তুমি নারায়ণ কি ভগবান আমি কিছুই বুঝতে চাইনা—শুধু যেন আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস তোমার ওপর থাকে—শুধু তোমাকে পেতে চাই অতি সহজ সরলভাবে জীবনের প্রতিটি উপলব্ধির মাঝে, যেখানে নাই কোন ভেদাভেদ, নাই কোন ভাল মন্দ--নাই কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব—সবই তুমি তুমিময়।

তোমার পায়ে রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

———

আমার দিন লিপি—

[৮ই মে হইতে ২০ জুলাই ১৯৬৯]

৮ই মে, ১৯৬৯ সাল। বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যা ৬৷৷০ টা

অসীম স্নেহময় দাদাকে মিঃ পি, এন, সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে প্রথম দর্শন—

৫ই মে সকালে ফোন পেয়ে বিছানা থেকে উঠে এসে ফোন ধরলাম। নিউ-আলীপুরের "জি" ব্লক থেকে মিসেস উষা সেনগুপ্তা ফোন করেছে। আমি ফোন ধরতেই বল্লে—"রেণু, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমার বাড়ীতে 'সত্যনারায়ণ' পূজা, তুমি সবাইকে নিয়ে এসো"। আমি বল্লাম—"কেন বাবা! পূজো টুজোতে ডাকছ, জান তো আমি নাস্তিক মানুষ।" উষাদি বল্লে—"তুমি যে কতবড় নাস্তিক না আস্তিক "তা" আমার জানা আছে। তুমি আসবে। আর যিনি পূজা করবেন, তাঁর অপূর্ব পূজা দেখে তুমি আনন্দ পাবে। ধূপ, ধূনা, গঙ্গাজল, ফুল, কোশাকুশী কিছুই লাগে না বা সেখানে থাকে না! কিন্তু দেখবে এসে কি হয়।" বল্লাম—"তথাস্তু। আমি যাবো—আর কারুর কথা বলতে পারছি না।"

বৃহস্পতিবার এলো—হয়তো এসেছিল আমার জন্য বৃহস্পতি লগ্নে। সেদিন থাকতো আমার উপোসের দিন—সারাদিনই নানারকম চিন্তাতে কেটে যায়। বিকালে ৫টার সময় স্নান ক'রে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে তৈরী হলাম উষাদির বাড়ীতে পূজা দেখতে যাবার জন্য। কি একটা আকর্ষণে অদ্ভূতভাবে মন টানছে। ভাবছি রওনা হবো—আবার ভাবছি এত তাড়াতাড়ি যাবো কেউ কিছু ভাববে নাকি? আবার মনের তাগিদে দেরীও সইছে না। যাক শেষ পর্যন্ত রওনা দিলাম উষাদির বাড়ীর উদ্দেশ্যে। আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছি, আর অনেক কথা

মনে খেলা করছে। ওইটুকুর জন্যেই আমার হাঁটতে ভাল লাগে—পথের ক্লান্তি বোধ হয় না—যাক্ সে কথা লক্ষ্যে পৌঁছে গেলাম।

উষাদির বাড়ীর গেটে পৌঁছেই সুন্দর গন্ধ নাকে এসে লাগলো। চেনা অথচ অচেনা অজানা লাগছে। মন মাতানো সুবাস।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম—ডান দিকের ড্রইং-রুমের দরজার কাছে এসেই দেখতে পেলাম "তাঁকে"।

উত্তরমুখে দরজার দিকে মুখ করে বসে আছেন সোফাতে। পরণে সাদা গরদের ধুতি ও খালি গা—গলায় নেই কোন উপবীত। সামনে রয়েছে চায়ের কাপ ও এ্যাশট্রে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। আমি দরজাতে দাঁড়াতেই আমার দিকে তাকালেন। আমি ঘরে ঢুকলাম। উষাদি বল্লে—"প্রণাম করো"। আমি এগিয়ে যেয়ে প্রণাম করে একটু পাশে সামনে বসলাম—কিন্তু ওঁকে দেখবার পর থেকেই আমার মন তোলপাড় করছে—ভাবছি বড় চেনা লাগছে—কোথায় ওঁকে দেখেছি? মনের ভিতর হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলাম আর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। "এ মুখ তো ভোলবার নয়।"

শুনলাম সবাই ওঁকে 'দাদা' বলে ডাকছে। নানাজনে ওঁর সম্বন্ধে নানা কথা বলছেন। কেউ বলছেন ১২০ বছরের ওপর বয়স, কিন্তু দেখতে লাগে ৪০।৪৫ বছর—এই সব আর কি।

এই সময় উষাদিকে উনি ডাকলেন। উষাদি কাছে আসতেই উষাদির শাড়ীর আঁচলে নিজের কপালটা পুঁছে দিলেন। আমাদের কাছে আনতে আমরা ঘ্রাণ নিয়ে দেখলাম অপূর্ব চন্দন গন্ধ। তখনও কিন্তু আমি বসে মনের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছি—কবে কোথায় 'ওঁকে' দেখেছি। অন্তরে অন্তরে অনুভূতিতে ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছি—এ সময় হঠাৎ উঠে 'উনি' পূজার ঘরে গেলেন। উনি যাবার সাথে সাথে আমার মনকে বিদ্যুৎ চমকের মতন খুঁজে পেলাম 'কোথায় ওঁকে

দেখেছি'। সেই আত্মস্থ মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে গভীরভাবে সাড়া দিয়েছিল।

আমি ঊষাদিকে সে কথা জানানোতে ঊষাদি আমাকে বল্লে দাদাকে জানাতে। আমি বল্লাম—"না! না! বোলবার দরকার নেই।"

কথাটা ছিল প্রায় ৮।৯ বছরের আগেকার (পরে দাদার কাছে জেনেছি ১৩৬৭ সনের ২৭শে আশ্বিন)। মহা অষ্টমী ৺পূজার দিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম—ইচ্ছা ছিল ৺পূজা দেবো মায়ের কাছে। কিন্তু অসম্ভব ভীড়। লাইন হয়েছে তাতে দাঁড়ানোও অসম্ভব। তবুও কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়ালাম। ৺মায়ের পূজা দেবার মতন মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করছিলাম। সে সময় দেখলাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাঁচর কেশ, গৌরবর্ণ লম্বা, সুশ্রী এক ভদ্রলোক নিজের ভেতর আত্মস্থ হয়ে কিছু স্তোত্র পাঠ করছিলেন। সে মূর্তি ভোলবার নয়—"বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া' সেই রকমই মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাঁকেই দেখছিলাম!

বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মনে হোল ৺পূজা দেবার আশা বৃথা। তখন জোরে জোরেই বলে ফেল্লাম "মাগো! তুমি তো সব জায়গাতেই আছো—তোমার পূজার উপচার আমি তোমার মন্দিরে ছুঁইয়ে এখানেই রেখে দেবো—ইচ্ছা হয় তুমি নিও, না হয় যা খুশী কোরো। আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা দিয়েই তোমার পূজা দিয়ে গেলাম—যা হয় হবে—আমি জানবো তুমিই গ্রহণ করেছ।" এই কথা বলে আমি চলে আসবো বলে ৺মায়ের মন্দিরে পূজার উপচার ছোঁয়াতে যাচ্ছি, হঠাৎ কানে এলো—"কেন পূজা দেওয়া হবে না? তুমি আমার কাছে দাও, আমি পূজা দিয়ে দিচ্ছি।" আমি তাকিয়ে দেখলাম "সেই তিনিই।" আমাকে চাতালে দাঁড়াতে বল্লেন পাঁচ মিনিট পরেই দেখলাম 'তিনি' পূজা দিয়ে ফিরে এসেছেন ও প্রসাদ আমার হাতে দিচ্ছেন। আমি তো ভেবেই পেলাম না এত তাড়াতাড়ি

কি করে উনি পূজা দিয়ে ফিরে এলেন। সূক্ষ্মদেহ ধারণ না করলে এ সম্ভব নয়। আর আমার কথা এত দূর থেকে কি করে শুনলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণাম করলাম। "তিনি" আমাকে আত্মস্থ হয়ে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। মনে হল হৃদয়ের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। কে এই মহাপুরুষ জানিনা। তারপর দক্ষিণেশ্বর গেলেই চারিদিকে তাঁকে খুঁজতাম কিন্তু বৃথা—। সেই আশীর্বাদের ভঙ্গিমা এখনও আমি ভুলিনি। এতদিন পরে আবার তাঁকে দেখতে পেলাম।

সেই সময়ে ছবির মতন আমার সামনে সবই স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ইনিই তিনি।" যিনি এখন সর্বময় পরম, আত্মার আত্মীয় ও সবার দাদা ভাই, স্নেহময় দাদা।

এখন থেকে আমি দাদা বলেই উল্লেখ করব। 'দাদা' পূজার ঘরে যেয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এদিকে বাইরে ভজন ও নামগান হ'তে লাগল। আমি রুদ্ধশ্বাসে বসে রইলাম। প্রায় ঘণ্টা খানেক কেটে গেলো—দাদা দরজা খুলে দিলেন। উষাদি সবাইকে পূজার ঘরে যাবার জন্যে ডাকলে।

কিছু গভীর দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও কিছুটা আবেগ নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। ঘর ধূপ ধুনার ধোঁয়ায়, নানারূপ ফুলের সৌরভে ও চন্দন, আতর ও কস্তুরীর গন্ধে আচ্ছন্ন ও ভরপূর। স্বর্গ কেমন জানিনা। ঘরে ঢুকে মনে হোল এই কি স্বর্গের পরিবেশ? মর্ত্তে কি এও সম্ভব? মাথা নত করলাম শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ রামঠাকুরের সামনে। আবেগে চোখের জল এসে গিয়েছিল। প্রণাম শেষ করে দেখি 'দাদা' ঘরের এক পাশের পালঙ্কের ওপর বসে আছেন। অপূর্ব অলৌকিক জ্যোতির্ময় মূর্তি। সবাইকে আশীর্বাদ করছেন। সেই দক্ষিণেশ্বরের কথা আবার আমার মনে পড়লো—মনে পড়লো তাঁর সেই মূর্তি।

মনে মনে দূর থেকে প্রণাম জানালাম। যখন আমার সুযোগ এলো

তাঁর সামনে গেলাম প্রণাম করবার জন্য। দাদা আমার দিকে তাকিয়ে আমার শাড়ীর আঁচলটা টেনে নিয়ে নিজের বুকটা পুঁছে দিলেন। সেই দাদার আশীর্বাদী কস্তুরী মৃগনাভির গন্ধ। ঘরের আসবাবপত্র যেখানে যা ছিল সব কিছুই স্বর্গীয় সুবাসে ভরপূর। মনে হচ্ছিল সব কিছু আবিলতার উর্দ্ধে স্বর্গরাজ্যে রয়েছি তখন।

বাহিরের সবাই দাদাকে প্রণাম করবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাই মনে গভীর আনন্দ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। মিনিট সাত আট পরেই উষাদি এসে বল্লে - "রেণু! তোকে দাদা ডাকছেন। আর তুই দাদার কাছে দক্ষিণেশ্বরের কথা বলিস।" মনে অপার আনন্দ বিস্ময় তখন। ধীরে ধীরে আবার দাদার কাছে গেলাম। কাছে যেতেই দাদা আমার শাড়ীর আঁচলটা নিয়ে কপাল থেকে ঘাম পুঁছে দিলেন। ঘাম তো নয়—সুবাসিত স্বর্গীয় আতরের কণাবিন্দু।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন "কিরে কি মনে হয়? কি বলবি বল?" আমার দ্বিধাগ্রস্ত মনে যদি কোন ভুল হয় সেই ভয় সেই জন্য দাদার কাছে ভুলের অপরাধ মার্জনা করতে বলে দক্ষিণেশ্বরের কথা নিবেদন করলাম। আবার মনে ভাবছি 'দাদা' কি করে জানলেন আমি কিছু বলতে চাই,—আমার কিছু প্রশ্ন আছে, তিনি কি অন্তর্যামী।

দাদা বরাভয় হাসি হেসে বল্লেন "ভুল কেন হবে? সব ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে, এতো হয়েই থাকে।"

দাদার কথা শুনে আমার মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব এক নিমেষের মধ্যে ঝড়ো হাওয়ার মতন উড়ে চলে গেলো; দাদাকে আবার প্রণাম করলাম—যদি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি কিছু থাকে সেটুকু উজাড় করে।

দাদা সেদিন অযাচিত কৃপা করেছিলেন আমার উপরে। তিনি নিজে কাছে না ডাকলে আমার মনের ও প্রাণের কথা ব্যক্ত করবারই সুযোগ হত না। কৃপাময়ের কৃপালাভে আমি ধন্য।

জাগতিক জীবনের বহুগণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল ঊষাদির বাড়ী শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা উপলক্ষ্যে ; সবাই অভিভূত।

যেটুকু বুঝেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল 'দাদার' কাছে সবাই সমান। দাদার অঙ্গগন্ধের সুবাসিত আশীর্ব্বাদ প্রায় ওখানে সবাই পেয়েছিলেন—কমপক্ষে ১৫০।২০০ জন। কেউ পেয়েছিলেন সুবাসিত নানা জাতীয় ফুলের গন্ধ—গোলাপ, যূঁই, চাঁপা, বকুল আবার কেউ কেউ পেয়েছিলেন স্বর্গীয় আতর, চন্দন ও মৃগনাভির গন্ধ।

একই অঙ্গে এত সুবাসিত বিভিন্ন গন্ধ যা শত শত লোকে আশীর্বাদী রূপে পেয়ে থাকেন। একি এ জগতের কোন মানবের পক্ষে সম্ভব ? শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গেরও তো অঙ্গগন্ধ সৌরভে তাঁকে সবাই জানতে পেরেছিল —"ইনি কি তবে তিনিই।" অঙ্গগন্ধ সৌরভই তো তাঁকে জানবার চিনবার প্রথম পথ।

এইসব মনে জাগছে আমার, সেজন্যে হয় তো অনেক কিছু নজরের বাইরে চলে গেছে শুধু একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁরই দিকে—

যাঁর স্তিমিত লোচন, সমাহিত অন্তর্দৃষ্টি মুহুর্মুহু এ জগতের কেউ নয় বলে প্রকাশ পাচ্ছিল, আবার মাঝে মাঝে সহজ সরল আমাদের একজন বলে মনে হচ্ছিল।

প্রসাদের প্রচুর আয়োজন ছিল। কিন্তু দাদার দেওয়া আশীর্বাদী প্রসাদে প্রাণমন ভরে ছিলো। এবার বাড়ী ফিরে আসবার পালা একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—ঊষাদি আমাকে যখন ফোন করেছিল তখন বলেছিল—"একটা শিশি খুব ভাল করে পরিষ্কার করে নিয়ে আসবে। কোন প্রশ্ন কোরনা।" ঊষাদির কথা মেনে নিয়ে ছিলাম। বাড়ী ফিরবো বলে ঊষাদি আমাকে সেই শিশিটা হাতে দিল—দেখলাম শিশি ভর্তি সুগন্ধযুক্ত জল—কিন্তু কোথাকার কিসের গন্ধ ঠিক করতে পারলাম না—পরে শুনেছিলাম "চরণ জল"।

সেই দিনেই প্রথম, এতদিন পরে আবার দাদার সাথে দেখা।

সব কিছু উপলব্ধি ঠিক মতন করতে পারছি না—কি যেন পাচ্ছি, কি যেন পাচ্ছিনা—মনে ভাব।

বাড়ী ফিরিবার আগে "দাদাকে" প্রণাম করতে গেলাম—তখন তিনি আবার ড্রইংরুমে এসে বসেছেন, পরনে ধুতি পাঞ্জাবী সেই চায়ের কাপটি সামনে, মুখে সিগারেট। আবার মাঝে মাঝে সিগারেট ভক্তদেরও দিচ্ছেন। আমি ঘরে ঢুকে ওঁকে প্রণাম কোরলাম। তিনি অন্তরে অন্তরে আমায় আশীর্বাদ করলেন। প্রণাম শেষ হবার পর বল্লেন—"তুই আমার ওখানে যাস।" আমি বল্লাম "আমি তো চিনি না, দাদা।" দাদা বল্লেন—"উষা, তোকে নিয়ে যাবে।" দাদার অনুমতি নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম পথে শুধু মনে হচ্ছিল এতদিন যা খুঁজে বেড়াচ্ছি তাকি আমি পাব? অথচ কি খুঁজে বেড়াচ্ছি তা নিজেও ভাল করে জানিনা।

আনন্দ পুলকে মন আমার—ভরে ছিলো ভাবছিলাম আবার কতদিনে "তাঁর" কাছে যেতে পারবো? কতদিনে তিনি ডাকবেন?

বাসায় ফিরে এলাম সবাইকে একটু গম্ভীর দেখলাম। বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল —আমিও বিশেষ কথাবার্তা না বলে শুয়ে পড়লাম। কথা বলবার মতন মনও তখন ছিল না। সকালে উঠে সব বলব বলে মনে ভাবলাম।

ঘুমিয়ে পড়েছি, স্বপ্ন দেখলাম—স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম।

একজন কে এসে আমার বুকের মাঝে অদ্ভুত ভাবে ছুঁয়ে দিলে—মনে হোল বিশ্বসংসার আলোয় আলোময় হয়ে উঠল—বুকের ভেতর সব যেন ভেঙ্গে চুরে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আলৌকিক জ্যোতি দর্শন হল।

জেগে উঠে স্বপ্নের আবেশে কিছুক্ষণ রইলাম আর মনে ভাবলাম "কেন এই স্বপ্ন দেখলাম আমি তো সেরকম কিছুই ভাবিনি, জানিনা এর তাৎপর্য কি? কে আমায় বলে দেবে? যা পেয়েছি স্বপ্নে—

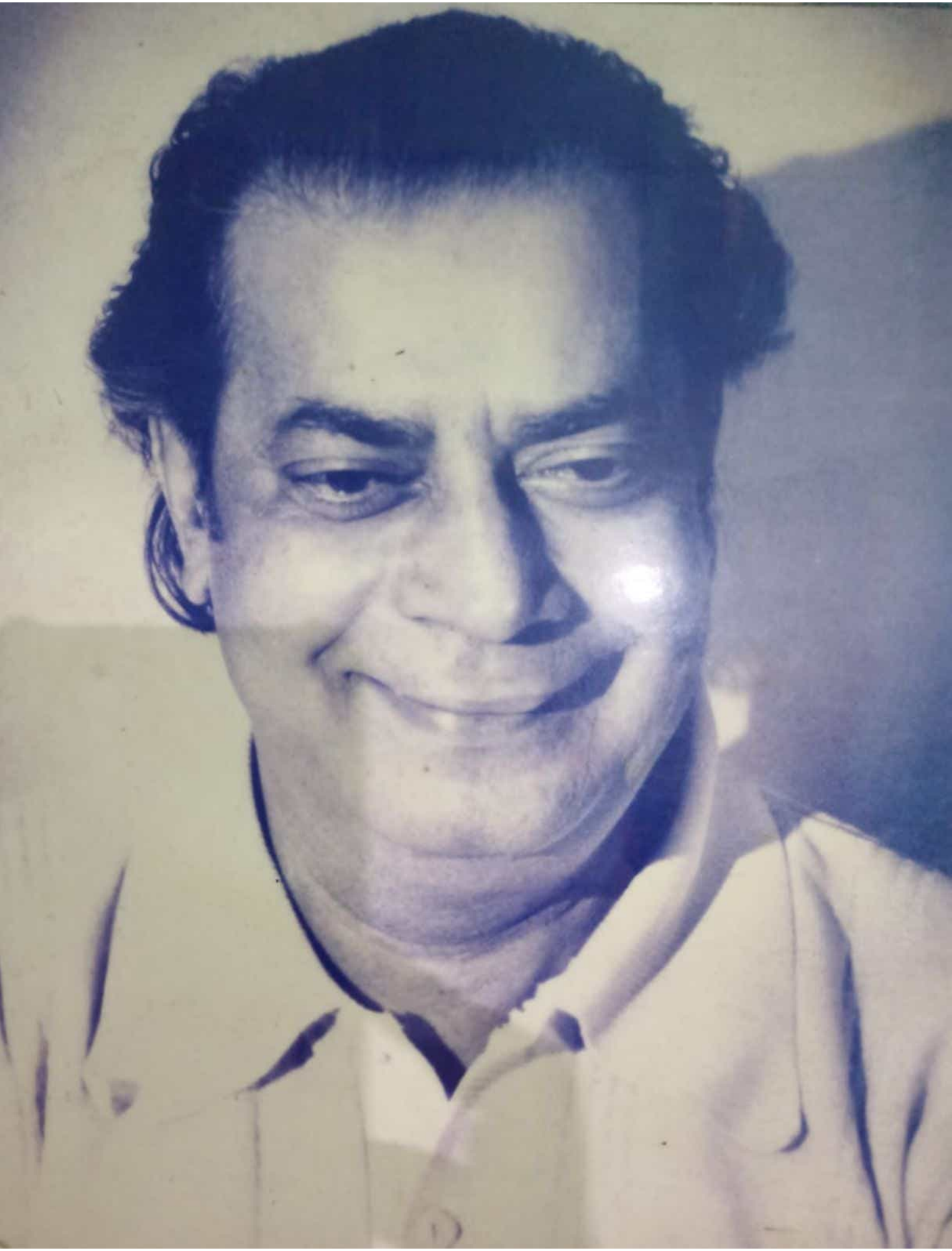

সত্যিকার জীবনে যাতে অনুভব করতে পারি সেই প্রার্থনাই করি" পরে "দাদাকে" স্বপ্নের কথা বলতে, দাদা বল্লেন—"কে সে বুঝতে পারলি না? সেই তো ছিল—এঁটাই ওখানে ছিল।" দাদা অসীম স্নেহভরে আমার দিকে তাকালেন।

আমি মনে মনে ভাবলাম দাদার খেলা দাদাই জানেন—আমার বুঝতে চেষ্টা করবার দরকার নেই।

তবে এই সঙ্গে আমি একটা কথা জানিয়ে রাখি মিসেস্ উষা সেনগুপ্তা ও মিঃ পি. এন. সেনগুপ্ত মহাশয়ের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ —যাদের মাধ্যমে দাদার দেখা আবার পেয়েছি।

"দাদাভাই"-এর সাথে এই আমার প্রথম দিনের বাস্তব ও অবাস্তব কাহিনী—এর মধ্যে এতটুকুও অতিরঞ্জিত নেই।

আমি মুর্খ—জ্ঞানবিদ্যা বুদ্ধি আমার কিছুই নাই—তাঁর কৃপাতে সহজ সরলভাবে যা মনে আসলো তাই লিখলাম। আমার অন্তরের শতকোটি প্রণাম "তাঁকেই" জানাচ্ছি।

———

[১০ মে, ১৯৬৯ সাল। শনিবার। দ্বিতীয় দর্শন।]

আমার সাথে দাদার আবার দেখা হোল 'দাদার' ভবনে।

মিসেস্ উষা সেনগুপ্তার বাড়ী থেকে ফিরবার পর উন্মুখ হয়ে রইলাম, কবে তাদের কাছে থেকে ডাক পাব 'দাদার' কাছে যাবার। কবে তিনি দয়া করে কাছে টানবেন।

৯ই মে সকালে উঠে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজার কথা ও পরম পূজনীয় দাদার কথা আমার স্বামী, ভাসুর, ছোটছেলে ও আমার বাড়ীর অন্যান্য সবাইকে বল্লাম—ওঁরা চুপ করে শুনলেন, কিন্তু কিছু মতামত প্রকাশ করলেন না!

সারাদিন আমার কেটে গেলো উদগ্রীব অপেক্ষায়, কিন্তু কোন চঞ্চলতা ছিল না। ১০ই মে ভোর ৫টাতে ফোন বেজে উঠলো; ত্বরিতপদে এসে ফোন ধরলাম। মন কেন যেন বলছিলো 'ট্রাঙ্ককল নয়—ঊষাদির ফোন।' ঠিক তাই, রিসিভার ওঠাতেই ঊষাদি বল্লে "তৈরী হও। ৬॥০ টা ৭ টার মধ্যে এসে 'দাদার' ওখানে যাবার জন্যে তোমাকে তুলে নেব!" স্বামীর অনুমতি নিয়ে "দাদার" কাছে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। কিন্তু ঘড়িতে ৭টা কেন ৭॥০ টা পার হয়ে গেলো; ওরা এলো না। মনে শঙ্কা জাগলো, ওরা কি আমায় নিতে ভুলে গেলো নাকি? নাঃ শেষ পর্য্যন্ত ৭টা ৩৫ মিনিটে ওদের গাড়ীর হর্ণ পেলাম। বেরিয়ে দেখলাম—গাড়ীতে ঊষাদি, মিঃ সেনগুপ্ত, ঊষাদির জা, ১২।১৩ বছরের একটি ছেলে ও বম্বের সিনেমা পরিচালক ৺বিমল রায়ের স্ত্রী মনোবীণা দেবী রয়েছেন। দেরী হয়ে গেছে, সবাই বলছিলেন "দাদাকে" বাসায় পাওয়া যাবে কিনা! আমার কিন্তু অন্তর বলছিলো—নিশ্চয়ই 'দাদার' দেখা পাবো—দেখা হবেই।

সত্যিই তাই—প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডে তাঁর বাড়ীতে এসে জানলাম 'দাদা' বাড়ীতেই আছেন—মন আনন্দে ভরে উঠলো।

'দাদা' সংসারী, তবে সংসারে থেকেও তিনি সংসারে পার্থিব জগতে আছেন বলে মনে হয় না।

বৌদির সাথে প্রথম দেখা হল কিন্তু আলাপ পরিচয় হল না। মনে মনে বৌদিকে প্রণাম জানালাম "অতি ভাগ্যবতী" বলে আর বৌদিও "শক্তির অংশ" বলে।

দোতলায় উঠে এলাম। সুন্দর একটি খোলামেলা ঘর—পূবদিকে রয়েছে এক ঢাকা বারান্দা—বারান্দার ডান পাশেই রয়েছে একটি ঘর—শুনলাম "দাদার" পূজার ঘর।

ঘরের একপাশে একটি পালঙ্কের উপর রয়েছে এক শয্যা—পাশেই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে মেঝে—সেখানেই বসলাম আমরা। দাদা তখনও

পূজার ঘর থেকে বের হননি। আমাদের আগেই ২।৪ জন এসে সেখানে অপেক্ষা করছেন—তারমধ্যে ঊষাদির ছোট বোন কণা সেনও আছেন।

একটু পরেই দেখলাম পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে 'দাদা' বারান্দায় পূবদিকে মুখ করে সূর্যদেবকে প্রণাম করছেন—পরণে গেরুয়া রং-এর বস্ত্রখণ্ড খালি গা ; আত্মনিমগ্ন জ্যোতির্ময় মূর্তি।

প্রণাম শেষে 'দাদা' ঘরে এসে ঢুকলেন—মুখে তাঁর স্নেহভরা মনভুলানো হাসি—চোখ দুটিও উজ্জ্বল হাসিতে ভরা—বল্লেন "আজ উঠতে দেরী হয়ে গেছে।" আমি তখন ভেবেছিলাম ঘুম থেকে উঠতে দেরী হয়েছে, না—পরে মনে হয়েছে পূজার আসন থেকে উঠতে। আমি একটু আগেই শুনেছিলাম—'দাদা' একজন অসুস্থ ভক্তের অসুখ নিয়ে খুবই ব্যস্ত—তাঁকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন, সেই জন্যে খুবই মানসিক স্ট্রেন চলছে—ভক্তটি পি. জি. হাসপাতালে আছেন। পরে সে কথায় আসছি।

'দাদা' ঘরে এসে খাটে বসলেন, সবাই আমরা তাঁকে প্রণাম করলাম—কেউ যখন তাঁকে প্রণাম করে তিনি আত্মস্থ হয়ে তারই মঙ্গল কামনা করেন। তাঁর দেহে যিনি বিরাজমান তাতেই মন যুক্ত ও আত্মস্থ হয়। ভারী সুন্দর সে রূপ। কল্যাণময় সবারই কল্যাণ কামনা করছেন!

প্রণামঅন্তে আমাকে সামনে বসতে বল্লেন—তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে নিলাম—বার বার আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। চোখ তাঁর হাসছিলো—চিবুকের মধ্যে হাত দিয়ে আদর করে দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে পেলাম সেই স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত সুগন্ধ—বিহ্বল হয়ে যাচ্ছিলাম। তখনও 'দাদার' সামনে—সহজ সরল হয়ে উঠতে পারিনি, হয়ে উঠিনি আজকের মত প্রগল্‌ভ—তখনও নিতে পারিনি 'দাদার' ছোট বোনটির অধিকার। এখন দাদার কাছ থেকে জোর

করেই আদায় করে নিচ্ছি—'দাদা' স্বেচ্ছায়ই সেই দাবী বা অধিকার মেনে নিয়েছেন! অতি আপনজনের কাছে ছাড়া অধিকার দাবী করা যায় কি? 'দাদা' সেই "আপনজন" যার কাছে সবকিছু বলা যায়, সব কিছুরই দাবী করা যায়।

[একটু পরেই আত্মস্থ হয়ে দাদা বল্লেন—"এই দুনিয়াতে কেউ কারো আপনও নয় পরও নয়! আপনও যা পরও তা। কে স্বামী? কে স্ত্রী? ছেলেও কেউনা মেয়েও কেউ না—সবই আপন সবই পর। শুধু 'তিনি' আপন, যিনি তোমাদের অন্তরে আছেন। তাঁকেই ধরে থাকো। 'এটার' অন্তরে যা আছে তোদের সবার মধ্যেই তিনিই আছেন—সুতরাং তুমিও যা, আমিও তাই, কেউ আলাদা নয়।

গুরু?

গুরু আবার কে? দীক্ষা কে দেবে? একদেহ আর একদেহকে কি দিতে পারে? এক অহঙ্কার আর এক অহঙ্কারকে দিচ্ছে। কেউ জগতে গুরু হতে পারে না। এক 'তিনি' ছাড়া। ত্যাগ, ভেক সব বাজে। গেরুয়া পরলে, জটা রাখলে—জটার ভার সামলাতেই অস্থির তো 'তাঁকে' ডাকবে কখন?

খাবে দাবে আনন্দ করবে, আনন্দে থাকবে আর পরম রসময়ের রস আস্বাদন করবে।

শ্রেষ্ঠ জন্ম মানুষ জন্ম তো তাঁরই জন্যে, তাঁকে নিয়ে আচার আচরণ করা, তাঁর মধুময় রস আস্বাদন করা। তাঁরই ওপর পরম নির্ভর করো—তাঁকেই ধরো, সব ঠিক—আর সব বেঠিক—নিজের নাই হদ্দিস—সে আর কি শেখাবে। "সচল তিনি"—অচল নিয়ে থেকো না—তাঁরই আরাধনা করো।']

দাদা কথা বলছেন আর মাঝে মাঝেই বলছেন "বুঝতে পারছিস্, না বুঝতে পারছিস্ না।" আর মাঝে মাঝে তাঁর নিজের অন্তরের অন্তরতমের সাথে নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছেন—চোখ অন্তর্দৃষ্টি—বাহ্যদৃষ্টিরহিত।

তাঁর এই কল্যাণময়, স্নেহময় গোপাল রূপ, সারা মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করছি বসে বসে। আমি তখন খুব কম কথা বলতাম। দাদার অন্তরের পরশে এখন আমার সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেছে। যেটা অন্তর থেকে অনুভব করি সেটা প্রকাশ করবার শক্তি দাদাই দিয়েছেন।

একটু পরেই আবার জাগতিক জগতে ফিরে এলেন। ঊষাদির দেওরের ছেলেকে অসুস্থতার জন্য একটা ঔষধ দিলেন। হাত উঁচু করতেই 'দাদার' হাতের মুঠোতে এসে গেলে সেই ঔষধ—সেটাই ওকে দিলেন—এসব 'দাদার' ব্যাপার, কি নিয়ে কি হয় সে নিয়ে মাথা ঘামাই না। তার পরে ৺বিমল রায়ের স্ত্রীকে চোখের জন্য 'চরণজল লাগিয়ে দিলেন। চোখটা একেবারে বুজে ছিল। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম চোখটা বেশ খানিকটা খুলে গেছে। তবে পরে দাদা বলেছিলেন "এ চোখ ভাল হবার নয়!"

বেলা ৯৷৷০টা বাজল, 'দাদা' ডাঃ অনিল মৈত্রের বাড়ী যাবেন শুনলাম—সেখানে যেয়ে রোজ সকালে চা খান ও জল খাবার গ্রহণ করেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করলে ডাঃ মৈত্র ও মিসেস মৈত্র 'অভুক্ত থাকেন। "দাদা" ঊষাদিকে বল্লেন, ডাঃ মৈত্রের বাড়ীতে নামিয়ে দিতে। দাদার আদেশমত আমরা সবাই ডাঃ মৈত্রের বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিলাম। ডাঃ মৈত্রের বাড়ীর কাছে এসে হঠাৎ "দাদা" ঊষাদিকে বল্লেন "চল তোর বাড়ীতেই চা খাব" সেদিন হয়ত কোন শুভ কারণের জন্য ডাঃ মৈত্রদের অভুক্ত রাখতে দাদার ইচ্ছা হোল—সেই জন্যেই ওইভাবে দোরগোড়ায় যেয়েও ফিরে এলেন।

"দাদার" সঙ্গ ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না—কিম্বা 'দাদাই' হয়তো আমাকেও ঊষাদির বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেলেন—মিসেস্ বিমল রায়ও গেলেন। "দাদার" সাথে আমরাও তাঁর চায়ের ও মিষ্টান্নের প্রসাদ পেলাম। সেদিন ছিল আমার উপোসের দিন—কিন্তু দাদার নিজের

হাতে দেওয়া প্রসাদ উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করার মতন শক্তি আমার ছিল না।

দাদা বসে আছেন সোফার উপরে উত্তর দিকে মুখ করে আমরা নীচে মেঝেতে বসে আছি। তখন সেখানে মিসেস বিমল রায়, তাঁর ছোট বোন, মিসেস আরতি সেন, রত্না রায়চৌধুরী, ঊষাদি, মিঃ সেনগুপ্ত ও আরও ২।১ জন উপস্থিত ছিলেন। দাদা দেখি হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে চুপ করে গেলেন। মাঝে মাঝে আক্ষেপসূচক উঃ আঃ করতে লাগলেন—হঠাৎ বলে উঠলেন "আঃ গেল, গেল, আর বুঝি রাখা গেল না"। ফোন তুলেই ডাঃ মৈত্রকে বললেন "শীগ্‌গীর হাসপাতালে চলে যাও, ওর অবস্থা খুব খারাপ। ওখানে যেয়ে ওর সারাগায়ে চরণজল ছিটিয়ে দাও" বলেই ফোন রেখে দিলেন। আবার পি, জি,-তে ডাঃ অজিত বসু ও ডাঃ বি. পি. ঘোষকে ফোন করতে চেষ্টা করলেন, লাইন পেলেন না। দাদার তখন অদ্ভুত অবস্থা। চুপ করে বসে আছেন। যেন দেহটাই শুধু বসে আছে—মন দেহের বাইরে। চোখ স্তিমিত, অন্তর্দৃষ্টি, যেন এই জগতের কেউ নয়। প্রায় আধঘণ্টার উপরে এই ভাবে কেটে গেলো আমরাও সব চুপ করে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি—হঠাৎ ফোন এলো। ফোন করলেন ডাঃ অনিল মৈত্র। বললেন "রুগীর অবস্থা এখন অনেক ভাল, ওখানে যেয়ে শুনলাম আপনি হাসপাতালে দেখতে এসেছিলেন। রুগী যখন ইউরিন পাস করলে তখন আপনি নাকি মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওরা সবাই বল্লেন, আপনি এসেছিলেন। আপনি এসেছিলেন নাকি দাদা?"

"দাদা" জবাব দিলেন "এই আশে পাশেই আছি, একটা গাড়ী নিয়ে ১৫ মিনিটের জন্য হাসপাতাল গিয়েছিলাম।" সে সব কথা শুনে আমি তো শুধু তাকিয়েই থাকলাম দাদার দিকে! এই তো আমাদের সামনে বসে আছেন। কখন আবার গেলেন হাসপাতালে? হঠাৎ মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠলো—সবই সম্ভব, ওর পক্ষে সবই

সম্ভব। এক দেহে এখানে বসে আছেন, সূক্ষ্মদেহে হাসপাতালে। এর পরিচয় যে ৯ বছর আগে দক্ষিণেশ্বরে পেয়েছি।

কিন্তু আমি অজ্ঞ, আমি মূর্খ তাই চিনেও চিনতে পারছি না। আমি বিচার করতে চাইনা, চাইনা কোন প্রমাণ। তুমি আমার প্রাণগোপাল, মনগোপাল, গোবিন্দগোপাল হয়ে আমার অন্তরে বিরাজ করো। ভক্তবৎসল তুমি, তুমি আমাদের 'মধুসূদন দাদা' তোমার স্নেহের আশ্রয় সবাই যেন পাই এই আমার প্রার্থনা।

"দাদা" ফোনে কথা বলছিলেন তখন ওধার থেকে যখন ডাঃ মৈত্র কথা বলছিলেন—তাঁর কথাটা উষাদির কানে ফোনটা দিয়ে শুনতে বলছিলেন।

প্রায় ১২টার সময় দুপুর বেলা আমরা উষাদির বাড়ী থেকে উঠলাম "দাদার" সঙ্গে। ["দাদা আমাকে বল্লেন "তুই পর পর ৫টা শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের ৺পূজা দেখবি। আগামী কাল ডাঃ দের বাড়ীতে নিউ-আলিপুরে 'ও' ব্লকে আছে সেখানে যাবি।"]

আমি দাদাকে বল্লাম, নিশ্চয়ই যাব দাদা—আপনি যখন ডেকেছেন! আপনি ডেকেছেন বলেই আপনার কাছে এসেছি আমার একটা কথা সব সময়েই মনে হয় "দাদা" যদি আমার মধ্যে কিছু থাকে, কিম্বা আমাকে যদি কারুর দরকার থাকে, উপযুক্ত মনে করলে তিনিই আমাকে খুঁজে নেবেন। তাঁর ডাকের জন্যই তো উন্মুখ হয়ে বসে আছি। এ আমার অহঙ্কার নয় দাদা, এ আমার কামনা।"

দাদাকে তখন মনে হচ্ছিল, আমার কত আপন, দুনিয়ায় এত আপন কেউ আছে কিনা জানিনা। স্বল্পবাক্ আমি। আমার কথা বলার মনের দ্বারও যেন খুলে গেল দাদার পরশ পেয়ে।

দাদা বল্লেন—"অহঙ্কার কেন হবে? 'এই তো ঠিক, ঠিক আছে, সব কিছু ঠিক হবে। তোমার মনের বাসনা বৃথা যাবে না।"

দাদার এই কথাই আমি পরম বিশ্বাসে মাথা পেতে মেনে নিলাম।

বাড়ীর সামনে গাড়ী এসে থামলো। "দাদাকে" প্রণাম করে, দাদার অনুমতি নিয়ে গাড়ী থেকে নামলাম। দাদা বল্লেন "এসো, আবার দেখা হবে।"

মনপ্রাণ কিছুতেই "দাদাকে" ছেড়ে দিতে চাইছিল না। কিন্তু একি ঠিক? এযে স্বার্থপরের মতন কথা। "দাদা" তো সবার জন্য তিনি সবার মধ্যেই সমভাবে বিরাজ করুন সেইতো ঠিক।

দাদা ভাই! তুমি আমায় আশীর্বাদ করো তোমার উপরেই যেন সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে পারি। তোমার মধ্য দিয়েই যেন সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়। তোমার উপরেই থাকে যেন আমার অচল অটল বিশ্বাস—সে বিশ্বাস যেন কোন কিছুতেই ভেঙ্গে না পড়ে। সংশয়ের ছায়া যদি কিছু পড়ে—তুমিই মিটিয়ে দিও দাদা! সেটুকু তোমাকে জানাবার শক্তি ও সাহস যেন তোমার ভেতর দিয়েই পাই। যে অপরূপ রতন আমি পেয়েছি তোমার আশীর্বাদে কিছুতেই হারিয়ে না ফেলি—

—দুঃখের সাগরে কুড়ায়ে পেয়েছি
অরূপ রতন রাশি,
ভাসায়ে তরণী সুখের সাগরে
আপনি পড়িব ভাসি।
রতনের মাঝে রতন মিলেছে
অরূপের মাঝে রূপ,
সুখের সাগরে তরণী ডুবেছে
নাই মোর কোন দুঃখ।

———

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

[১১ই মে ১৯৬৯ সাল। রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা। ডাঃ মধুসূদন দে মহাশয়ের বাড়ীতে আমার তৃতীয় দর্শন।]

১১ই মে রবিবার, ১৯৬৯ সাল, এই দিনটা আমার জীবনের অতি স্মরণীয় ও বিশেষ দিন।

দাদার অহৈতুকী আশীর্বাদে জীবন পরিপূর্ণ হয়েছে ঐ বিশেষ দিনটাতে।

অনেকেই আমাকে বলে, বয়েস হোতে চল্লো এই বারে দীক্ষা-টীক্ষা নে!

কেউ বলে রামকৃষ্ণ মিশনেও তো যাও, সেখানে তো দীক্ষা নিতে পারে।

আমার বাবা, মা মিশনের শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন—সে জন্যে ছোটবেলা থেকেই আমাদের মিশনে যাওয়া আসা ছিলো। তবুও মন কেন যেন ভরতো না। তাছাড়া দীক্ষা কারো কাছে নেবো এই ভাবে নিজের মনটাকেও তৈরী করতে পারি নাই। মনে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিলো আমি কখনও কারো কাছে দীক্ষার জন্য যাবোনা। যদি আমার সময় হয়ে থাকে, যদি কারো প্রয়োজন থাকে, যদি আমায় উপযুক্ত মনে করেন তো তিনিই আমাকে ডেকে নেবেন। আমি দৌড়া-দৌড়ি করতে পারবোনা।

আর একটা নাম ছোট বেলার থেকেই আমার অন্তরে গেঁথে রয়েছে সে নামটা হচ্ছে 'মা' নাম। আমার সমস্ত হৃদয় গভীর প্রশান্তিতে ভরিয়ে দেয়, মনে এনে দেয় অসীম নির্ভরতা। সে 'মা' আমার জাগতিক 'মা' না ব্রহ্মময়ী 'মা' তা আমি জানিনা। আমি জানি যিনি 'মা' তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই হরি, তিনিই শ্যামা তিনিই শ্রী শ্রী গোবিন্দ মাধব শ্যাম। একাধারে তিনিই সর্বশক্তির আঁধার,

তিনিই সর্বময়। যে ভাবেই আমরা ডাকি, যে নামেই আমরা ডাকি, সবই তাঁর কাছে সমান।

আমাদের পরম স্নেহময় ভক্তবৎসল 'দাদাভাই' আমার মনের কথা জানেন বলে বলেছিলেন, "সবই একরে—তোর কাছে যে ভাবে ভাবতে ভাল লাগে তাই ভাবিস।"

তাঁর কাছে নাই কোন জাতিভেদ, নাই কোন ধর্মের ভেদাভেদ। তিনি যে "একম্ অদ্বিতীয়ম", পুরুষ নারী একাধারে সবই তিনি, তিনিময়।

দাদাভাই, তুমি আমার গুরু কিনা জানিনা, কিন্তু আমি জানি, তুমি আমার মা, তুমি আমার বাবা, তুমি আমার সন্তান, আমিও তোমার সন্তান। তুমি আমার গোপাল, গোবিন্দ গোপাল, তুমি আমার সব।

১১ই মে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মনে একটা গভীর আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম, সন্ধ্যাতে আবার দাদার দেখা পাবো ও পূজাতে যোগ দিতে পারবো বলে।

তখনও ডাক্তার দে কে আমি জানতাম না। কোথায় যাচ্ছি বা কার বাড়ী যাচ্ছি, সে প্রশ্ন মনে একবারও ওঠেনি। "দাদা" ডেকেছেন, যাচ্ছি। পরে অবশ্য মিসেস দে মিনুকে দেখে পরিচয় পেলাম।

ডাঃ দের বাড়ীতে আমার জীবনের মহালগ্ন এলো, সে কথায় পরে আসছি।

আমার সত্যনারায়ণ পূজাতে যোগ দেবার আনন্দের ভাগ আরও ২।৪ জনকে দেবার জন্য, আসতে বলে ফোনে যোগাযোগ কোরলাম, অবিশ্যি দাদার অনুমতি নেওয়া ছিলো।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে আছি, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা তারই মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম—দুটি ছেলে একটার বয়েস বছর ৩।৪

আর একটী ১বছর দেড় বছরের হবে, আমার মাঝের ঘরে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোট ছেলেটি টলমল করে সারা ঘর হেঁটে বেড়াচ্ছে,—অতি সুন্দর-কান্তি, সৌন্দর্যের আলোতে ঝলমল করছে, দিব্য কান্তি—হঠাৎ হাটতে, হাটতে আমার ফ্রীজের কাছে এসে টলে পড়ে গেলো, পা দুটো তার ফ্রীজের নীচে ঢুকে গেলো। কত ব্যথা লেগেছে ভেবে আমি আর আমার স্বামী দৌড়ে এলাম তোলবার জন্যে, কিছুতেই তাকে তুলতে পারলাম না। যতই তাকে তুলতে যাচ্ছি, ততই তার ওজন বেড়ে যাচ্চে—একটুকুও নাড়াতে পারছিনা। ঘুম ভেঙ্গে গেলো, দেখলাম ঘেমে নেয়ে গেছি! মনে মনে ভাবলাম দুপুরবেলা এ দিবাস্বপ্ন কেন!

বিকালবেলা পূজায় যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি, এমন সময় ঊষাদি ফোনে জানালো "তুমি এখুনি চলে এসো, দাদা এসে গেছেন"। যাদের আসবার কথা ছিলো পূজাতে যোগ দেবার জন্য, তাঁদের জন্য আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে পড়লাম। আমার স্বামী তাঁদের পৌঁছে দেবার ভার নিলেন, কারণ আমার স্বামী তখনও পূজাতে যোগ দিতে চান নি, আমিও কোন জোর করি নি। "দাদার" ইচ্ছা হলে তাঁকে আসতেই হবে জানি।

ডাঃ দের বাড়ীতে ঢুকতেই ডান-দিকের জানলায় তাকিয়ে দেখি "দাদা" বসে আছেন জামাইটি সেজে। পরণে গিলাকরা পাঞ্জাবী ও ধুতি, মুখে সিগারেটটি। দাদা বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, জানলা দিয়ে আমাকে দেখে হেসে হাত দিয়ে ডাকলেন। "দাদার" এই ভুবন ভোলানো হাসি সবারই জন্য। বিশেষ করে কারো জন্যে আছে বলে মনে হয় না। তিনি যে সর্বজনের সর্বমঙ্গলময় দাদা।

ঘরে ঢুকেই 'দাদার' সোফার পার্শে জায়গা ছিলো সেখানে বসতে বল্লেন। দাদা মাঝে মাঝে কথা বোলছিলেন আমার সাথে। এই

সময় মঞ্জু চক্রবর্তী, শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তীর স্ত্রী, এসে ঘরে ঢুকলো। দাদা আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

হঠাৎ দাদা উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে, মিসেস আরতি সেন ও রত্না রায় চৌধুরীকে ওর সাথে যেতে বল্লেন! পূজার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বল্লেন—["তোমাদের আমি একটা জিনিষ দিতে চাই, যদি তোমাদের মত থাকে। তবে মনে রাখবে গুরুটুক কেউ হোতে পারে না। যিনি দেবার তিনিই দেবেন, আর তোমাদের পাবার হলে তোমরা পাবে। এর দক্ষিণা যদি দিতে চাও, তাঁকে স্মরণ মনন্ করবে, তবেই তাঁর দক্ষিণা দেওয়া হবে। কেমন বুঝলে তো, না বুঝলে না, গুরু একমাত্র তিনিই হোতে পারেন।"]

আমি বোল্লাম "দাদা ·আমার একটা নিবেদন আছে। আমি তো নিয়ম করে কিছুই করতে পারি না, জপ, পূজা আমার কিছুই আসে না। কিছুদিন একটানা কিছু করলে আমার মনে হয় এ যেন গতানুগতিক, এর মধ্যে প্রাণ নেই, ভক্তি নেই। নিয়মমাফিক না হলে শুধু আছে ভয়। শুধু মনে মনে যা ভাববার তাই ভাবি। তাই করলে যদি চলে তবে কোন আর আমার দ্বিধা নেই।

["দাদা" অপার করুণাকণ্ঠে বল্লেন—"জপ কোরছি, পূজা কোরছি এ তো অহঙ্কার রে। তুই মনে মনে যে ভাবে ভাবিস, সেই ভাবে ভাবলেই যথেষ্ট।"]

দাদা ডাঃ দে কে ডেকে সাদা কাগজ দিতে বল্লেন।

ডাঃ দে রুল টানা সাদা কাগজ নিয়ে এলেন। ছোট ছোট কাগজের টুকরো ওখান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আমাদের হাতে দিলেন, আর বাকী কাগজটা ডাঃ দের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে দাদা আমাদের মনে মনে ধ্যান করে নিয়ে প্রণাম করতে বল্লেন সাষ্টাঙ্গে শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ দেবের সামনে। হাতের কাগজটা আমাদের সামনে রেখে আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কোরলাম।

দাদা আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনুভব হচ্ছিল যেন স্থির ও অচল হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর অসীম শক্তির তড়িৎপ্রবাহ যেন আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করছে।

একটু পরে দাদার আদেশে উঠলাম, উঠে দাদাকে প্রণাম কোরলাম। আমার চোখে দাদা তখন পার্থিব জগতের ছিলেন না।

"দাদা" আবার বল্লেন যদি কিছু পেয়ে থাকো, ভাল করে দেখে মনে গেঁথে রাখো—আর যদি না পেয়ে থাকো তো পাবে না। কাগজটা খুলে দেখো।

আমি কাগজ খুলতেই লালকালীতে লেখা একটা নাম দেখতে পেলাম। ভাবের অভিব্যক্তিতে নিজের অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

"দাদা" আবার আমাদের বোল্লেন—"যদি কিছু পেয়ে থাকো! ভাল করে মনে রাখো। মনে রেখেছো তো! মনে করে সেই নামটা স্মরণ করে আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করো।"

দাদার আদেশ মেনে নিয়ে—শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ দেবের কাছে প্রণাম জানিয়ে "দাদাকে" প্রণাম কোরলাম। "কাগজ" খুলে দেখলাম নামটা মিলিয়ে গেছে। সাদা রুলটানা কাগজ পড়ে রয়েছে।

রুলটানা কাগজ তো নয়, প্রাণের স্পন্দন বলে মনে হচ্ছিল তখন।

"দাদা" বল্লেন "এবার আমি বসবো। পূজা শেষে দরজা খুলে গেলে তোমরা আজ প্রথম এসে এই ঘরের পরিবেশ দেখবে। ডাঃ দেকে বলে রেখে দাও, আমি বলেছি বলে।"

আমার মনের কি অবস্থা তখন, একমাত্র দাদাই হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন। বহুদিনের আমার একটি সাধ এই ভাবে পূর্ণ হোল—যার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও আমি ভাবতে পারিনি।

সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমরা শুধু ভেবেই মরি, যা হবার, যা কোরবার তিনিই করেন।

"দাদা" ! তোমার আশীর্বাদ চাই— যেন তোমার "অন্তরের এঁটার পরে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, থাকে আমার সম্পূর্ণ নির্ভরতা।

পূজা শেষে ঘরে ঢুকে দেখলাম, সেই মোহময় স্বর্গীয় পরিবেশ— তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন "জ্যোতির্ময় পূর্ণব্রহ্ম", সবার মঙ্গল কামনায় ঠোঁট দুটী নড়ছে। আত্মস্থ মূর্তি। ভগবানের সচল রূপ।

হঠাৎ "দাদা" বল্লেন, আমার পিঠটা পুঁছিয়ে দেতো—

মিনু তোয়ালে নিয়ে আসছিলো, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—

"তোর আঁচল দিয়ে আমার পিঠটা পুঁছিয়ে দে"

সেদিন "কৃপাময়ের কৃপা" আমার উপরে উথলে উঠেছিলো "অহৈতুকী কৃপা" কেন? তার কি কারণ কোন দিনই জানতে চেষ্টা করিনি, যেটুকু পেয়েছি তাতেই আমার জীবন ধন্য।

আমার শাড়ীর আঁচল দিয়ে অতি সন্তর্পণে "তার" পিঠ পুঁছিয়ে দিলাম, ননীর দেহ পাছে ব্যথা লাগে।

"দাদার" সেই অঙ্গ-গন্ধের অপূর্ব সুগন্ধ আমার শাড়ীর আঁচলের সাথে আমার মনে প্রাণে জড়িয়ে রইলো।

পূজার ঘর থেকে "দাদা" বাইরের ঘরে এসে বসলেন! কাছে যেয়ে বোসলাম তাঁর। মন ভরপূর। "দাদাকে" দুপুরের স্বপ্নের কথা বলাতে "দাদা" বল্লেন—

"কি পেলি বুঝতে পারছিস না? তিনিই তোর বাড়ীতে এসেছেন"

"দাদার" কথাই নত মাথায় মেনে নিলাম, শুধু মনে মনে ভাবলাম—

কে গো তুমি ঠাকুর!
হাসিতেছ অতি মধুর,
তব কৃপা দিলে জনে জনে,
"দাদা" বলে সবে তোমায় জানে।

"লীলাময়", তোমার অনন্ত লীলার কথা—একমাত্র তুমিই জানো —এ বুঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা না করাই ভাল। আশীর্বাদ করো শুধু অন্তরে যেন উপলব্ধি হয়। লীলাময় মঙ্গলময় তুমি! সবারই কল্যাণ করো, এই প্রার্থনা...তোমার আশীর্বাদী সুবাসিত সুগন্ধে ভরপুর হউক, জাগরূক হউক সবার হৃদয়।

শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে তোমাকে জানাই আমার প্রণাম।

[১১ই মে রবিবার ১৯৬৯ সাল। ডাঃ মধুসূদন দে মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজার দিন অলৌকিক ঘটনা।]

ডাঃ দের বাড়ীর পূজার দিনে আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনার কথা শুনলাম,— মিসেস মাধুরী মৈত্রের কাছে।

পূজাতে যোগ দেবার জন্যে মাধুরী, ডাঃ মানস মৈত্র, আমাদের বৌদি, ডাঃ সুনীল গুপ্ত, মিসেস এস. এন. সেন ও আইভি, এই ছয়জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন ট্যাক্সির জন্যে, কিন্তু ট্যাক্সি পাচ্ছেন না। ২।১টী ট্যাক্সি যদি বা আসছে, ছয়জন আরোহী দেখে "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী" বলে চলে যাচ্ছে। এমন সময় আনকোরা নূতন এক ট্যাক্সি এসে থামলো, আর কোন আপত্তি না করে ছয়জনকে নিয়েই রওনা হোল।

মাধুরী ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেখে বলতে লাগলো একি এই ড্রাইভারের মুখের হাসিটী যেন ঠিক অবিকল দাদার মতন। আমরা ট্যাক্সি না পাওয়াতে দাদাই কি ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়ে ট্যাক্সি নিয়ে এলেন নাকি?

তারপর হোল কি, ডাঃ দে'র বাড়ী "ও" ব্লক নিউ আলিপুরে মাধু ও অন্যান্য সবাইকে নামিয়ে দিয়ে "জি" ব্লকে ঐ ট্যাক্সি নিয়েই

ডাঃ মানস মৈত্র রুগী দেখতে গেলেন। সেখানে পৌঁছে ট্যাক্সিকে অপেক্ষা করতে বল্লেন আবার ডাঃ দে'র বাড়ীর পূজার কাছে আসবেন বলে। ফিরে এসে দেখেন ট্যাক্সি উধাও। এমন কি প্রাপ্য ভাড়া পর্যন্ত নিয়ে যায় নি।

এদিকে মাধুরী ডাঃ দে'র বাড়ীতে এসে জানতে পারলো "দাদা একটু পূজার ঘরে গেছেন। খানিকক্ষণ পরেই "দাদা" পূজা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, মুখে ছিল দুষ্টামীর হাসি।

ডাঃ মানস মৈত্র যখন ডাঃ দের বাড়ীতে এলেন, তখন দাদা শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ দেবের পূজা করতে পূজার ঘরে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

পূজাঅন্তে দাদা বেরিয়ে এলে সবাই দাদাকে প্রণাম করছে,—ডাঃ মানস মৈত্র যেয়ে প্রণাম করতেই বল্লেন—"কিরে আমার ঘাড়ে চেপে ছয়জনই এলি তো? ট্যাক্সির ভাড়া দিলি না তো? আমার সময় হয়ে গেছিল বলে, তোর জন্যে আর দেরী করতে পারলাম না।"

দাদার কথা শুনে ডাঃ মৈত্রের কাছে সব জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গেলো, কে এই ট্যাক্সি ড্রাইভার কোথা থেকে এলো এই ট্যাক্সি।

ভিন্ন দেহে ভগবানই রয়েছেন সাথে সাথে। অভিভূত—ডাঃ মানস মৈত্র দাদাকে প্রণাম করলেন। মনে মনে ভাবলেন—

ভক্ত সঙ্গে জনে জনে
করিছেন লীলা।

১২ই মে, ১৯৬৯ সাল। সোমবার—
শ্রদ্ধেয় দাদার ও আমার পরীক্ষায় হারজিতের খেলার সুরু

আমাদের দেশে একটা কথা আছে "বড় কিছু পেলে আবার কিছু দিতে হয়"। কিন্তু কি দিতে হয়েছিল আমাকে সে কথায় পরে আস্‌ছি।

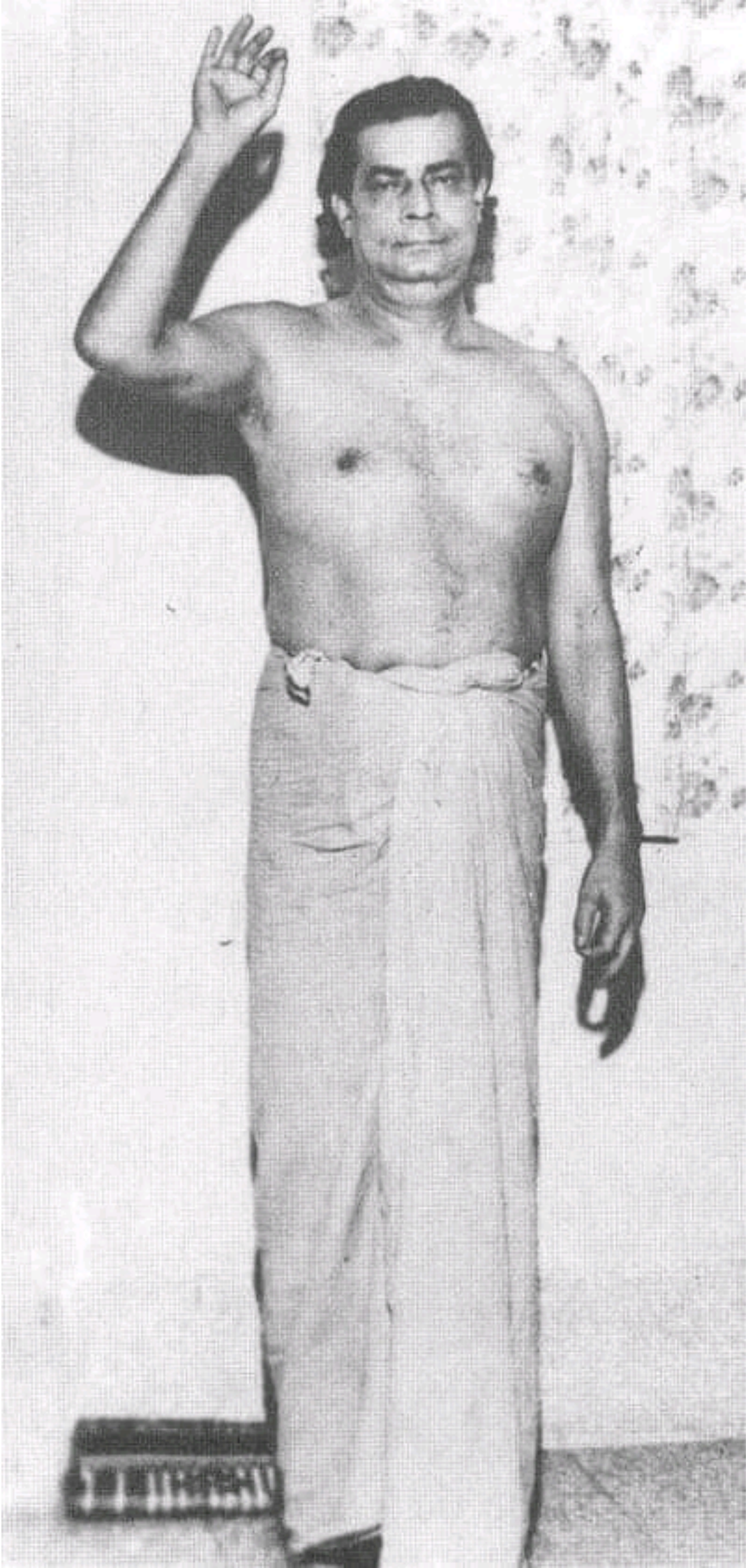

১২ই মে সকালে "দাদার" বিরুদ্ধে মন্তব্য করে একটা ফোন এলো আমার স্বামীর কাছে, তাতে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে ওসব জায়গায় আমাকে যেতে অনুমতি না দেওয়া হয়।

আমাকে আমার স্বামী যখন বল্লেন, আমি বোল্লাম "মানুষের মন তো সব একরকম নয়। আমি তো সাংসারিক কোন কামনা বাসনা নিয়ে 'দাদার' কাছে যাই নি! তুমি একবার নিজেই "দাদাকে" দেখবে চল না কেন?" উনি রাজী হয়ে গেলেন। দাদাও আমাকে বলেছিলেন—

"তোর স্বামীকে নিয়ে একদিন আসিস্ আমার বাড়ীতে।"

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, ১৪ই মে সকালে "দাদার" ওখানে যেয়ে দেখা পেলাম না। বৌদির কাছে যেয়ে শুনলাম, ভক্ত এক রোগীকে দেখতে পি. জি. হাসপাতালে গেছেন 'দাদা'।

মনে মনে ভাবলাম "দাদা ভাই! এ তোমার কি মর্জি—বলেও ওঁর সঙ্গে দেখা করলে না কেন? তুমি আমায় কত পরীক্ষা করবে কর। আমিও তোমাকে ছাড়ছি না। "দাদা" বলে যখন ডাকবার অধিকার দিয়েছ, তখন ছোট বোনের অত্যাচারও তোমার সইতে হবে, তুমি দেখে নিও। স্নেহময় তুমি; আমরা ব্যথা পেলে সে আঘাত তোমারই যেয়ে লাগবে। দেখা যাক্ স্নেহের খেলায় কে হারে কে জেতে। এই ভাবে হোল আমাদের খেলার সুরু।

———

১৮ই মে, ১৯৬৯ সাল। রবিবার সন্ধ্যা ৬॥০। তৃতীয় দর্শন।

"দাদার" খেলার ও আমাকে পরীক্ষার মধ্যে নিরীক্ষণ কোরবার সুরু আমার স্বামী শ্রীপরিমল চন্দ্র গুহের দাদাকে প্রথম দর্শন।

১৮ই মে রবিবার সন্ধ্যায়, বেহালায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল দাস মহাশয়ের বাড়ীতে সেদিন "দাদা" শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজায় বসবেন।

অনেক কষ্টে আমার স্বামীকে রাজী করালাম পূজাতে যাবার জন্যে। তিনি বল্লেন "আমি কিন্তু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে পারবো না।"

আমি বোল্লাম "তুমি যা ইচ্ছা তাই কোরো, তবুও তুমি চল।"

ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় রায় বেহালাতেই থাকেন—সেখানে সবাই একসাথে মিলিত হয়ে পূজা বাড়ীতে যাবার কথা। কিন্তু ওখানে যাবার আগেও কত বিঘ্ন। ড্রাইভার ঠিক সময় মতন এলো না, আবার ট্যাক্সি পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত বাড়ী থেকে খানিকটা দূরে এসে ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। "দাদা" কিন্তু সেদিন আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়ে আসেন নি—কিম্বা আমার চোখ নেই মাধুর মতন তাই দেখতে পাই নি। আমাদের কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে যাবার কথা ছিলো—তাঁদের তুলে নিয়ে আমরা ডাঃ রায়ের বাড়ী পৌঁছালাম। অনেকেই তখন ওখানে এসে গেছেন। আমাদের দেখে "দাদা" সেই স্নেহময় হাসি হাসলেন। তার পর বল্লেন "চল পূজার যায়গায় যাওয়া যাক্"—

ওর মধ্যেই আমাকে বল্লেন—"তোর স্বামীকে দেখলাম, অতি উঁচু দরের সজ্জন খাঁটি লোক-রে।"

মনে একটু আনন্দ হোল—জিজ্ঞাসা কোরলাম "আপনি দেখেছেন "দাদা" ?

"দাদা" বল্লেন "হ্যাঁ দেখেছি। আমি মনে মনে ভাবলাম, এক মূহূর্ত দেখেই কি "দাদা" সব বুঝে নিলেন। জানি না "দাদার" কথা দাদাই জানেন।

মিঃ দাসের বাড়ী পৌঁছে "দাদা" পূজার ঘরে বসলেন।

পূজা অন্তে সেই অপূর্ব চন্দন গন্ধ, সুবাসিত অঙ্গগন্ধ বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়লো। তখনও নাম গান চল্‌ছিলো গাইছিলেন মিসেস জিনিয়া গুপ্তা, মিনু, মাধু, মঞ্জু এরা সবাই।

আমরা অন্য ঘরে বসে ছিলান। শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ রামঠাকুরের ওখানে প্রণাম করে অনেক পরে "দাদার" কাছে এলাম। দেখলাম

উনি একটা পালঙ্কের ওপর বসে আছেন,—খালি গা, পরণে পট্টবস্ত্র। তখনও কাপড় ছাড়েন নি।

সামনে এসে প্রণাম করতেই উনি আমার চিবুক ধরে আদর করে দিলেন— সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব সুগন্ধে আমার দেহ ছেয়ে গেলো—স্মিত-হাস্যে "দাদা" আমাকে ওঁর পাশে বসতে বল্লেন। আমি ইতস্ততঃ করাতে বল্লেন—

["বোস্‌না তুই। তুইও যা আমিও তাই। আচ্ছা এই গরদের কাপড় পরে পূজা করলে কি বেশী শুদ্ধ হয় নাকি রে? মনই আসলে সব। শুদ্ধ অশুদ্ধ, কিছুই নাই।"]

ভক্তি ভাজন "দাদার" আদেশে আমি ওঁর পাশে বোসলাম। বোসবার পর "দাদা" আমার বাহুতে হাত রেখে আবার বল্লেন—

"তোর স্বামীকে দেখলাম, অতি সজ্জন, অতি চমৎকার, অতি খাঁটি লোক রে।"

আমি হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, "এবার কিন্তু হিংসে হচ্ছে। আপনি একটু দেখেই এরকম করছেন আর আমরা বুঝি সব খুব খারাপ।"

"দাদা" তখন সান্ত্বনা কণ্ঠে বল্লেন "না রে না, তোরাও খুব ভালো।"

ঘরে মঞ্জু চক্রবর্ত্তী, ঊষা, মিসেস সেনগুপ্তা, বিভূতি সরকার, ডাঃ অনিল মৈত্র ও অন্যান্য সবাই ছিলেন। সবাই প্রায় তখন প্রসাদ নিতে ব্যস্ত। সেই সময় আমার স্বামী আমাদের বন্ধুর সাথে সেই ঘরে ঢুকে "দাদাকে" পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেখেই বুঝতে পারলাম দাদাকে আমার স্বামীর ভাল লেগেছে। দাদা ওঁকে বল্লেন "তুমি আমার ওখানে এসো।"

কিন্তু "দাদা" যে আমার সাথে কি খেলা কোরবার জল্পনা কল্পনা করে বসে আছেন, তা কি আমি জানি তখন? খুব তো ডেকে ডেকে

কাছে বসালেন, কত স্নেহ, কত সুগন্ধী আশীর্বাদ, তার পরেই আরম্ভ হোল আমার ওপর কঠিন পরীক্ষা। যে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে সেই একমাত্র বুঝতে পেরেছে, আর বুঝতে পেরেছেন "দাদা"! সেই জন্যেই বলেছিলাম, "বড় কিছু পেলে আবার বড় কিছু দিতেও হয়।"

দাদার সম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য, সত্যনারায়ণের পাঁচালী দেওয়া নিয়ে ব্যঙ্গ—যে বাড়ীতে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পূজা হয়, সে বাড়ীর যে কোন জায়গার থেকে হাত বাড়িয়ে "দাদা" বের করে দেন কৈবল্য ধামের সত্যনারায়ণের পাঁচালী—মনে হয় ইচ্ছামত দাদার হাতে এসে পড়ে বাড়ী ফিরবার পথে যখন এই সব কথাগুলি হচ্ছিল, শুনে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল, ব্যথায় মন ভরে যাছিল, ভাবছিলাম, হায়রে মানুষ! হায়রে তার মন।" স্বর্গীয় পরিবেশে এতক্ষণ থেকেও মানুষের হুঁস হোল না।

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলাম, যখন এই সব কথা শুনে আমার স্বামী হলেন বিরূপ, বল্লেন "তুমি আর যেতে পারবে না,—" সত্যিই তখন আর আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওর "দাদাকে" ভাল লেগেছে, কারণ গাড়ীতে উঠেই বোলেছিলেন "দাদার" সম্বন্ধে—"অন্তদৃষ্টি, যোগীপুরুষ" কিন্তু বন্ধু বান্ধবের কথায় মন ধোঁয়ায় আছন্ন হোল।

আমি বন্ধু বান্ধবদের বোল্লাম "তোমরা দাদার কাছে হামেশাই যাও,—যদি তোমাদের সবার বিশ্বাস নেই তবে যাও কেন? যাবেও আবার এই সব কথা বলবে! যাও বুঝি ভয়ে, পাছে তোমাদের কোন ক্ষতি হয় এই ভেবে? কিন্তু ওসব কথা আমাকে বলে লাভ নেই। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমার মনের যা দৃঢ় বিশ্বাস সেই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে একচুলও নড়াতে পারবে না। নিজের অন্তরে যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছি, সে—প্রতিষ্ঠিতই থাকবে। "দাদাকে"

আমি কথা দিয়েছি পর পর পাঁচটা সত্যনারায়ণ পূজা দেখবো,—সে কথা দেওয়ার সত্য থেকে আমি ভ্রষ্ট হতে পারবো না।"

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিলো আমার কথা শুনে বন্ধুরা বল্লেন,—"তুমি যে খুব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছ—রাগ করছো।" আমি বোল্লাম—"তোমরা ভুল বুঝেছ—রাগ নয়, বড় ব্যথা পাচ্ছি।"

বাসায় এলাম রাত তখন ১০॥০ টা হবে। আমার স্বামী খুব উত্তেজিত। অনেক কিছু আমাকে বল্লেন, আমি চুপ করে শুনে গেলাম।

শুধু বোল্লাম "তুমি কেন উত্তেজিত হচ্ছ? তোমার অনুমতি ছাড়া, আর পূজা দেখতে যাওয়া ছাড়া "দাদার" ওখানে যাবো না। শুধু ৫টি পূজাতে যোগ দিতে আমায় মানা কোর না। আমি সহজ সরল ভাবে দাদার কাছে যেতে চাই, মনের কোন ভার নিয়ে নয়।" আরও ২।১টা কথা তাঁকে শান্ত ভাবে বোল্লাম।

তখন কয়েকদিন সত্যিই আমি একটা ভাবে আছন্ন ছিলাম,—নিজের মনের মধ্যে "দাদাকে" উপলব্ধি কোরবার চেষ্টা কোরছিলাম। সেজন্য সংসারের কিছুই আমার মনে সাড়া দিচ্ছিল না।

মনে মনে দাদাকে বোল্লাম—তুমি যদি সত্য হও, তোমার কাছে আসবার পথ আমার সহজ ও সরল করে দাও,—কি করে করবে সে তুমিই জান, তুমি যদি অন্তর্যামী হও,—তাহলে তুমি সবই বুঝতে পারছো। তবে এত যাতনা কেন? আর কত পরীক্ষা করবে ঠাকুর। তোমার খেলার রঙ্গ থেকে ত্রাণ করো ঠাকুর!—

এই ভাবে কয়েকদিন কেটে গেলো—হঠাৎ ডাঃ বি. পি. ঘোষের বাড়ী থেকে "দাদা" ফোন করলেন। আমি তো "দাদাকে" ফোন নাম্বার দিই নি, তাই হঠাৎ "দাদার" ফোন পেয়ে অবাক হলেও আশ্চর্য হইনি, কারণ 'তাঁর' সঙ্গে তখন আমার পরীক্ষা পরীক্ষা খেলা চলছে।

ফোনে "দাদা" জিজ্ঞাসা করলেন 'কি রে কি খবর ?'

আমি উত্তরে বোল্লাম "বাড়ীতে বড় ঝড় বৃষ্টি চলছে, কখনও জোরে হাওয়া, কখন আস্তে হাওয়া বইছে।"

"দাদা" বল্লেন "জানি, যদি তোর ওখানে একদিন দুম করে এসে পড়ি।"

আমি বোল্লাম "সে তো আমার সৌভাগ্য, তবে এখন ঝড় বেশ জোরেই বইছে,—তার মুখোমুখি দাঁড়াবার ভার আপনার।"

"দাদা', বল্লেন "আচ্ছা আচ্ছা ভাবিস না সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো সাথেই আছি।'

আমি তো অপেক্ষা করে আছি, কবে দাদা "অনুগ্রহ করবেন, কবে আমার পথ সহজ ও সুগম করে দেবেন—এই করে দিন কেটে যায়—

দিন গত পাপক্ষয়ের মত
দিন যে আমার কেটে যায়,
একে কি দিন কাটানো বলে,
এদিনগুলি মোর কাটবে কি হায়।

কবে তুমি দেখাবে পথ
নেবে কবে দীনের বোঝা ;
দীনের মাঝে, দীন যে আমি
আমার পথ করহে সোজা।

দীন নাথ তুমি যে আমার
আমার দিন করহ পার,
ক্লান্ত আমি শ্রান্ত আমি
পার কর হে পারাবার।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

দীনের বেশে তোমার পাশে
দিন যেন মোর যায় কেটে,
দীনের দীন, কড়ি বিহীন,
বিকাও আমায় তোমায় হাটে।

[২৫শে, রবিবার ১৯৬৯ সাল সকাল ১০টা ভগবানের প্রেরিত দূত। দাদার ভবনে আমার চতুর্থ দর্শন।]

২৫শে মে সকালে উঠে দাদার কাছে খুব যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু মিঃ গুহের কাছে বোলবার ভরসাও পাচ্ছিলাম না। যা "দাদা" করবেন সেই ভেবেই শান্ত মনে বসে রইলাম। হঠাৎ সকাল ৮টার সময় ভগবানের প্রেরিত দূতের মতন মণ্টু (অখিল সরকার, ইঞ্জিনায়ার, আমার পুত্র স্থানীয়) খড়গপুর থেকে এসে উপস্থিত। ওকে আমার স্বামী খুবই স্নেহ করেন,—তাছাড়া ছেলেটির ঈশ্বরদত্ত উপলব্ধি আছে। "সুবুধ" ধর্ম্ম সমিতির সেক্রেটারী ছিল। সেখানে হিন্দু মুসলমান, ক্রীশ্চান, সর্বজাতীয় লোকই সভ্য।

আমি মণ্টুকে "দাদার" কথা বলে, জিজ্ঞাসা কোরলাম, "যাবি নাকিরে তোর জ্যাঠামনিকে বলে দর্শন করে আসবি ? তোর কি মনে হয় তোর জ্যাঠামনিকে এসে বোলবি ?"

মণ্টু জিজ্ঞাসা করাতে "দাদার" কাছে যেতে উনি আর আপত্তি কোরলেন না।

যখন দাদার কাছে যেয়ে পৌঁছালাম তখন অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক ভদ্র মহিলা "দাদাকে" জিজ্ঞাসা কোরছিলেন, "সন্তান ও স্বামীর অসুখ হলে মন বিচলিত হয়, অস্থির হয়, তা শান্ত কোরবার উপায় কি ?"

আমি ঘরে ঢুকে "দাদাকে" প্রণাম করে "তাঁর" কাছেই বসে-ছিলাম। হঠাৎ মনে হোল আমার মনের সব কথাই "দাদাকে" বলা যায়। আমার মনের এই অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আমি অমনি বোল্লাম—

"'দাদা' এ সময় আমার একটা কথা মনে হয়—আপনাকে বলবো ?"

"দাদা" অভয় হাসি হেসে বল্লেন "নিশ্চয়ই বোলবি।"

"দাদার" অনুমতি ও অভয় পেয়ে বোল্লাম "সন্তান ও প্রিয়জনদের অসুখ বিসুখ হলে কিংবা বাড়ীতে কোন বিপদ হোলে, আমার কি মনে হয় জানেন "দাদা"—ভগবান! এ সংসারে তো নিজের ইচ্ছায় আসিনি, এ সংসারে স্বামী, সন্তান, প্রিয়জন সবই "তোমার" দেওয়া, এদের দায়িত্ব ও চিন্তা তোমারই। তুমি রাখতে হলে রাখবে, নিতে হলে নেবে, আমি কিছুই জানিনা। আমি "তোমার" পরেই নির্ভর করে বসে রইলাম সবকিছু মাথা পেতে নেবো বলে। কর্তব্য যেটুকু দিয়েছ, সেটুকু তোমারই দেওয়া শক্তিতে যেন প্রাণপণ করে যেতে পারি সেই আশীর্বাদই করো "তুমি"।

এই কথা আমার মুখের কথা নয়—আমার সন্তানদের ও স্বামীর কঠিন অসুখ কোরেছিলো—ডাক্তারেরা আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু অসীম "শক্তিময়ের" উপর নির্ভর করে, মনে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হোত।

আমার এ কথা শুনে "দাদা" দাড়িয়ে উঠলেন ও বল্লেন—

"'হরিবোল' তোর তো হয়েই গেছে, আয় তো আমার সঙ্গে আয়।"

এই বলে সামনের বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন, সেখানে তখন কল্যাণকুমার সিন্‌হা ও ডাঃ অনিল মৈত্র দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সেই বারন্দার সামনের জানলার পাশ দিয়ে উঠে গেছে একটি

'মাধবী লতা'—সেই গাছের ডাল, পাতা ছাড়া আর অন্য কিছুই ছিলো না। গাছের একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে আমি।

দেখলাম হঠাৎ "দাদা" হাত বাড়িয়ে দিলেন সেই দিকে! যেন শূন্য থেকে হাতে এসে পড়লো একটা রোল করা চক্‌চকে সাদা কাগজ। কারো প্রতিকৃতি তার মধ্যে আছে বলে মনে হচ্ছিল,—আমার হাতে দিয়ে বল্লেন।"

"এই নে বাঁধিয়ে রাখবি, একটা তোর বৌদি আরতিকে দিবি।"

আমি তো বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছি, কিছুই বুঝতে পারছিনা, কি হয়ে গেলো,—"দাদা" কি বড় ম্যাজিসিয়ান নাকি, যে ম্যাজিকে দুনিয়া চলছে। আরো অবাক বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো। "দাদা" এর পরেই বারান্দার পাশেই "তাঁর" পূজার ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন

ঘরে ঢুকে—হাত উঁচুতে তুলে মুঠো করে নিয়ে বল্লেন "নে ধর।"

আমি কিছু চিন্তা না করেই হাত পাতলাম। হাতে পড়লো মস্ত-বড় একটা সন্দেশ, গঠন নৈপুণ্য অতি সুন্দর। চারিপাশ রেখা কাটা ভেতরটা ছিল চকোলেটে পরিপূর্ণ, পরে বাড়ীতে এসে দেখতে পেয়েছিলাম।

"এর ব্যাখ্যা কি, তুমি যদি কোন দিন জানবার সুযোগ দাও "দাদা" তবেই জান্‌তে পারবো। মনের ভাব ও ভাষা মনের মধ্যেই লেখা রইলো।"

"দাদা" বল্লেন, "সন্দেশ তুই বাড়ীতে নিয়ে যাবি।"

"দাদার" আদেশ মেনে নিয়ে পুলকিত, বিস্মিত অন্তরে "দাদার" অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে এলাম, কারণ সবার সামনে থাকবার মতন মনের অবস্থা আমার থাকে না। মন খোঁজে নির্জনতা।

পথে আসতে কাগজের রোলটি খুলে দেখলাম "শ্রীশ্রীরামঠাকুরের পট" নীচে লেখা আছে—

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ।

মনে মনে প্রণাম জানালাম।

মন্টুকে জিজ্ঞাসা কোরলাম "কিরে আমার দাদাকে কেমন লাগলো? কি অনুভব কোরলি?" মন্টু বললে "মহাযোগী পুরুষ।"

[২৫শে মে রবিবার ১৯৬৯ সাল সন্ধ্যা ৭টা। মিঃ বি. সি. নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে পঞ্চম দর্শন।]

২৫শে মে সন্ধ্যায় মিঃ বি. সি. নাগের বাড়ীতে "দাদা" পূজায় বসবেন।

মিসেস উষা সেন গুপ্তা ও মিঃ পি. এন. সেনগুপ্তের সাথে ওখানে গেলাম। আমার স্বামী পূজায় যোগ দিতে আর কোন বাধা দেন নি।

প্রায় সন্ধ্যা ৭টার সময় পর্ণশ্রীর পূজা বাড়ীতে যেয়ে পৌঁছালাম। এই সময় উষাদি সত্যিই আমার কর্ণধার ছিলেন—সেজন্যে আবারও আমি বলছি, যাদের সহায়তায় আমি আমার কথার সত্য রক্ষা করতে পেরেছি ও "দাদার" পূজায় যোগ দিতে পেরেছি, চিরকৃতজ্ঞ আমি তাঁদের কাছে।

উপরে উঠে গেলাম দেখলাম ঘর ভর্তি—সবাই প্রায় এসে গেছেন আমাদের পরম প্রিয়—"দাদা" যে ঘরে বসে ছিলেন, সে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েই তাঁর অপরূপ রূপ দেখলাম।

সোফার উপরে বসে আছেন "দাদা"—খালি গা, পরণে গেরুয়া বসন, "দাদার" রঙ এর সাথে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। চা ও সিগারেট দাদার সাথী, তারাও ঠিক জায়গা মতন তাঁর সাথে আছে।

অপরূপ ক্ষমা সুন্দর চেহারা 'দাদার'। আমার মনে হচ্ছিল, এই কি ছিল 'বুদ্ধদেবের রূপ'? ক্ষমাসুন্দর রূপে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি, সবারই কল্যাণ-কামনায় মগ্ন!

প্রণাম করে একটু দূরে যেয়ে বোসলাম। 'দাদা' পূজার ঘরে ঢুকলেন, তখনও দরজা বন্ধ করেন নি। দূর থেকেই দেখলাম, হাত জোড় করে প্রণাম করছেন শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ দেবকে।

নব ঘন, নবরূপে প্রণামরত মূর্তি। মনে মনে ভাবলাম, নিজেই নিজেকে প্রণাম করছো "দাদা"। "দাদা" দরজা বন্ধ করে দিলেন, নাম গান আরম্ভ হোল। বৌদি, মাধু, মিনু, মঞ্জু আরও ২।৪ জন নাম গান কোরছিলো। বৌদির গান সেই প্রথম শুনলাম, সুললিত কণ্ঠ, তন্ময় হয়ে গাইছিলেন।

নাম গান শুনতে শুনতে "দাদার" কৃপায় তারই মধ্যে আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। ভজন থামতে তাকিয়ে দেখি পূজা শেষ হয়ে গেছে সবাই পূজার ঘরে চলেছেন।

দূর থেকে দেখছি ঘর গাঢ় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। তার ভেতর দিয়ে আবছা, আবছা, "দাদা ভাইকে" দেখতে পাচ্ছি। অতি মনোহর, মনোময় রূপ,—দ্যুলোক, ভূলোক আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"কত রূপে দেখা দেবে ঠাকুর! তোমার মনমোহন, মনভুলানো রূপ অন্তরে চিরজাগরূক থাকুক—সেই আশীর্বাদই করো। অতি অজ্ঞান, অন্ধ আমি, তোমাকে বুঝবার ও জানবার ক্ষমতা আমার কোথায়? তুমি দয়া করে বুঝিয়ে না দিলে, তুমি শক্তি না দিলে, শক্তিহীন আমি। তুমি শুদ্ধা ভক্তি না দিলে, কোথায় পাবো ভক্তি? সবই যে তুমি! তুমি দয়া, তুমি মায়া, তুমি ভক্তি, তুমি শক্তি! তুমি কৃপা না করলে সব বৃথা।

"দাদা" যখন পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আগের আসনে বসলেন, কাছে যেয়ে অন্তরের সব শ্রদ্ধা উজাড় করে প্রণাম

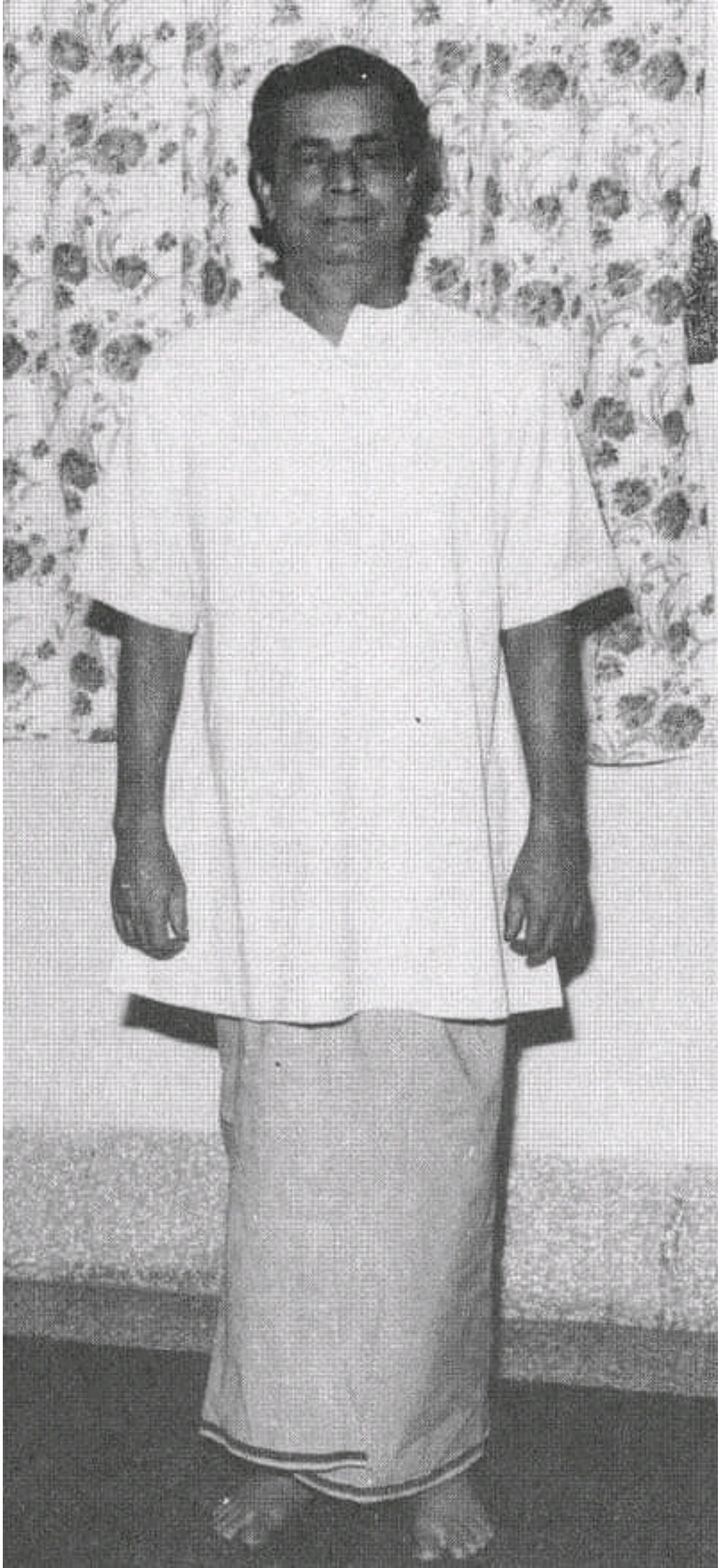

কোরলাম।—"দাদার" পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়লেই—শ্রীশ্রীগোরাঙ্গদেবের পদযুগলের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

"দাদার লীলা"

প্রণাম শেষ হতেই 'দাদা' কাছে বসতে বোল্লেন। সেই সময় অভূতপূর্ব এক ঘটনা ঘট্‌লো।

২০।২২ বছরের একটি ছেলে,—পরণে গেরুয়া বসন, খালি গা, ঘরের মধ্যে এসে উদয় হয়ে "দাদার" সামনে বস্‌লে। বসেই স্তোত্র ও গানে দাদার বন্দনা করতে লাগলো। বন্দনা শেষে রামপ্রসাদী মায়ের গান আরম্ভ করলে গাইতে! অপূর্ব উদাত্ত কণ্ঠস্বর। সুরের মূর্চ্ছনায় সারা ঘর গম্ গম্ করছে।

চিত্রার্পিতের মতন বসে, সেই ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম,—মাঝে মাঝে "দাদাকে"ও দেখছিলাম, মুখে তাঁর মৃদু হাসি। মনে হচ্ছিল—

"বন্দনা তব নূতন ছন্দে
ওগো বন্দিত তব বন্দে"

এই যুবকটী কে? পূজা শেষে হঠাৎ এসে উপস্থিত হোলেন। কত লীলা, কত ছলনাইতো চলছে।

প্রভু, নিজে পূজারীর বেশে নিজের পূজা নিজেই তো করে চলেছেন।

'তব মহিমা তুমিই জান।'

গান ও বন্দনা শেষে ছেলেটী নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে "দাদাকে" প্রণাম করলে, পায়ে মাথা রেখে,—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে আমাদের সবাইকে প্রণাম জানিয়ে মধুর স্বরে বল্লে—এখন আসি তবে মা।

"দাদা" ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে দরজার কাছে গেলেন ও হাত উঁচু করে এনে দিলেন স্বর্গীয় সন্দেশের প্রসাদ। ছেলেটীর হাতে দিয়ে বল্লেন—নে-খা'। মনে হোল নিজেকেই নিজে আপ্যায়িত করলেন।

তারপর ছেলেটী কোথায় মিলিয়ে গেলো, আর দেখতে পাওয়া গেলনা, সিঁড়ি দিয়ে নামতেও তাঁকে কেউ দেখে নি। পূজার প্রসাদ দেবার জন্যে তাঁর সন্ধান করা হোল—কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলো না,—কোথা থেকে এসেছিলো, কোথায় তার আবাস।

আমার মনের পর্দা তখন অন্য সুরে বাঁধা ছিলো। ভাবছিলাম আমি মায়ের গান শুনতে ভালবাসি, তাই কি 'দাদা' আমায় এই ভাবে শুনিয়ে দিলেন, জানিয়ে দিলেন সবই এক। 'একের' মধ্যেই সব একাকার হয়ে যাচ্ছে পরমব্রহ্মে, নিজের সত্তায়।'

তুই যাকে দেখলি, সে আর আমি আলাদা নই,—অভিন্ন দেহে একই বস্তুর প্রকাশ।"

তিনি দয়া করে বুঝিয়ে না দিলে বুঝবার সাধ্য কি আমাদের আছে?

লীলাময়! তোমার লীলা খেলা তুমিই পরম স্নেহভরে জানিয়ে দিলে সবাইকে ও সবাকার অন্তরে উপলব্ধি এনে দিলে যে—

সে যুবক ও তুমি একই—তোমার মাঝে সে মিলিয়ে আছে।

হে পরম পুরুষ! হে পরম যোগী, যোগস্থিত অবস্থায় প্রসাদ রূপে তুমি প্রসাদ বিতরণ করে যাচ্ছো অযাচিত ভাবে ধনী, দরিদ্র, সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত সমভাবে সবারই মধ্যে।

তোমার অপার করুণা, সবারই অন্তরে চির জাগরূক হউক, সেই প্রার্থনাই করি। মনে বিভোর আবেশ নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম "দাদাকে" প্রণাম করে।

সে সময় কারো সাথে কথা বলতে বা আলাপ আলোচনা করতে

মন চায় না,—শুধু অন্তরে অন্তরে থাকে পূর্ণ উপলব্ধি কোরবার প্রয়াস ও দাদার আশীর্বাদ ভিক্ষা।

দাও আলো মোরে, কর আলো দান,
যে আলোতে মিলিবে সত্যের সন্ধান।
যে আলোতে মিলিবে শুধু ভগবান
সেই আলো মোরে দাও আজ এনে
আলোর আলোতে নেব মম পথ চিনে॥

———

১লা জুন রবিবার ১৯৬৯ সাল সন্ধ্যা ৭টা। শ্রীযুক্ত যতীন ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ। ষষ্ঠ দর্শন।

সন্ধ্যাবেলা ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাশয়ের বাড়ীতে মিলিত হয়ে আমরা শ্রীযুক্ত যতীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে পূজাতে যোগ দেবার জন্যে রওনা হোলাম।

সাথে আছেন আমাদের অকুল পথের কাণ্ডারী নিজেই—

আমাদের পরম আপনজন "দাদা।" শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ নিজেই নিজের পূজারী —অভূতপূর্ব ব্যাপার নয় কি ?

দাদার আদেশ ছিল পর পর পাঁচটী সত্যনারায়ণ পূজা দেখবার— সেদিন ছিলো আমার পঞ্চম দিন।

আকাশে মেঘ ও বিদ্যুৎ চম্‌কানি দেখা যাচ্ছিল, যতীন বাবুর বাসার ছাদেই বোসবার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কিন্তু বৃষ্টির জন্যে কোন অসুবিধা হয় নাই।

পরে শুনলাম "দাদা" বলেছেন—চতুর্দিক বৃষ্টি হলেও, এখানকার আশে পাশে বৃষ্টি হবে না। সত্যি দেখলামও তাই,—অত মেঘ থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টি ঝরে পড়লো না। এর তাৎপর্য পরে বুঝতে পেরেছিলাম।

দাদা ছাদে সমাহিত হয়ে বসে আছেন, মাধু প্রাণ ঢেলে গান করলে—

আমি কি ভুলতে পারি,
নিঠুর তোমারে হরি—

মাধুর অন্তরের গানের ভাবটী বড় সুন্দর, মহাভাবে পাগল মাধু। একটু পরে "দাদা" পূজার ঘরে নীচে চলে গেলেন—ওপরে নাম গান হোতে লাগলো। অনেকেই তাতে যোগ দিয়েছিলেন ।

আমি নিজে নামগান করতে পারি না, সুর নেই বলে, কিন্তু কেন জানিনা নামগান শুনলেই ছোট বেলা থেকেই আমার বুকের মধ্যে আবেগে অসহ্য অনুভূতির আলোড়ন হয়।—সেই অনুভূতি নিয়েই আমি বসে ছিলাম।—কতক্ষণ সময় কেটে গেছে জানি না, খানিকক্ষণ পরেই অনুভব করতে লাগলাম—

অপূর্ব সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত ও আমার চতুর্দিকে ধূপের ধোঁয়ার ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। কোথায় কোন্ রাজ্যে চলে গিয়েছি, যেখানে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই, আছে শুধু—পরম বিশ্বাস ও স্বর্গীয় শান্তি।

কত সময় এই ভাবে বসে ছিলাম জানি না,—দাদা কখন পূজা শেষ করে উপরে উঠে এসেছেন, তাও বুঝতে পারি নি।

যখন তাকিয়ে দেখলাম, দেখতে পেলাম আমার অন্তরে শঙ্খ, চক্র হাতে "শ্রীশ্রীপার্থ সারথি রূপে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—মাথায় রয়েছে সোনার মুকুট। অতি মনোহর সে রূপ।

নয়ন আমার সার্থক হোল, জনম আমার সার্থক হোল। আমার অন্তরের অনন্তরূপ মিলিয়ে একসাথে মিশিয়ে গেলো "দাদার মধ্যে।"

কি জানি কেন সেই মুহূর্তে আমি "দাদাকে" যেয়ে প্রণাম করতে পারলাম না। মনে হোল বাহ্যিক প্রণাম যেন নিজের অন্তরকে ফাঁকি দিয়ে লোক দেখানো শিষ্টাচার।—অন্তরের যে উপলব্ধি পেলাম,

সেটাই অন্তরের "নিগূঢ়তম সত্য"—যার প্রকাশের কোন প্রয়োজন নেই।

সে দিন আমার যে কি হোল, মনে হয় সবই "দাদার" ইচ্ছা' ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা আমি শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদও গ্রহণ করতে পারলাম না। (একটা কথা লিখতে ভুলে গেছি, প্রতি বাড়ীতেই থাকে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজার প্রসাদের প্রচুর আয়োজন।)

কৃপাময়ের কৃপায় যে প্রসাদ অন্তরে পেলাম, সেই আমার মন প্রাণ ভরে রইলো,—বাহ্যিক কিছু যেন ভাল লাগলো না। মন তখন সব কথা হারিয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে যেতে চায়।

দাদা আমি কিছু জানি না, জানতে চাইও না,—এতে যদি আমার কোন অপরাধ বা অহঙ্কার হয় "সে সব তুমি"—তোমাকে কখনও ভয় যেন না করি, ভালবাসতে পারি, ধর্মভীরু না হয়ে, ধর্ম আশ্রিত যেন হতে পারি।

হে রহস্যময়! রহস্যভরা এ জগতে তুমিই রহস্যের উদ্ঘাটন করে দাও। অন্তরের অন্তরে বিলীন হয়ে থাকতে দাও! আকুল করে দাও অসহ্য ব্যাকুলতার মাঝে, তোমায় খুঁজে পাবার।

পাগল করে দাও,—লোক লজ্জা, ভয়, সব ঘুচিয়ে—রহস্যজালে—আবৃত পৃথিবীর পথে, পথে "তোমাকে" না পাবার ব্যথায় কেঁদে কেঁদে ফিরতে পারি,—"দেখা দাও বলে"।

তোমার রহস্যজালের জালে যেন আবদ্ধ না হয়ে পাড়ি প্রভু!

দাদার আদেশে ডাঃ রায় ও ডাক্তার মানস মৈত্রের সাথে বাড়ী ফিরে এলাম। আমার স্বামী, আমাকে পূজাতে যোগ দিতে বাধাও দিতেন না, কিন্তু নিজেও যেতেন না।

বাড়ী ফেরবার আগে "দাদা" আমায় ডেকে বল্লেন—"শোন্

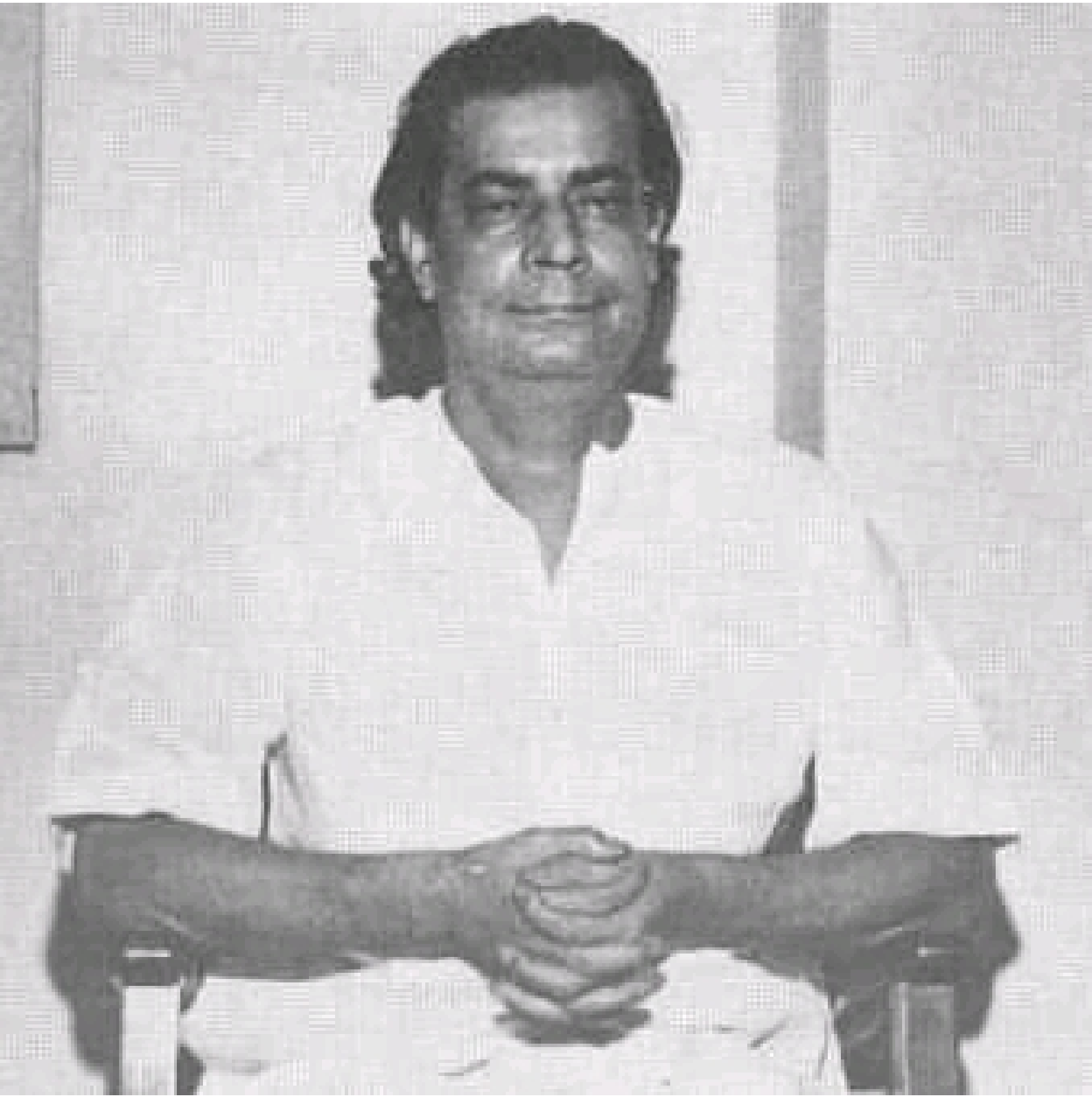

কাল তোর বাড়ী যাবো—সকাল ৭-টায় আসিস্ আমাকে নিয়ে যেতে।"

বাড়ীতে এসে আমার স্বামী মিঃ গুহকে বোল্লাম "দাদা"—কাল সকালে আমাদের এখানে আসবেন। "মনে কোন শঙ্কা—ছিল না", দাদার কাজ "দাদাই" বুঝবেন—এই ভাব। আর এও আমি জানি আমার স্বামী কারোর সাথে অভদ্রতা করেন না। অদ্ভুত তাঁর সৌজন্য বোধ। কঠিন কথা বলে কারুর মনে আঘাত দিতে চান না—বাড়ীতে এলে তার কাছে সব সমান সমাদর—কি ধনী, কি দরিদ্র। এখানে—"দাদার" কথা তো আলাদা।

উনি বল্লেন "ঠিক আছে, তুমি যেয়ে নিয়ে এসো। আমার যা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাস্য জেনে নেবো।"

আমি বোল্লাম "তোমার যা জিজ্ঞাসা কোরবার, তুমি সব জিজ্ঞাসা কোরো, প্রাণ খুলে, মনে কোন দ্বিধা না রেখে।"

আমি তো জানি অকূল পাথারের যিনি কর্ণধার, তিনি জীবনেরও কর্ণধার। তাঁরই ওপর অসীম নির্ভরতা। সব সহজ সরল হয়ে যাক্ প্রভু!

— ——

[২রা জুন, সোমবার, ১৯৬৯ সাল সময় সকাল ৮টা। শ্রীযুক্ত পরিমল চন্দ্র গুহের বাড়ীতে দাদার আগমন। সপ্তম দর্শন।]

নিউআলিপুরের 'পি' ফর 'পুওর' ব্লকে থাকি, অতি সাধারণ মানুষ আমরা। "দাদার" কাছে সব সমান। তাই দাদা 'বিনা আমন্ত্রণে' আমাদের এখানে আসবেন বলে মন আনন্দে অধীর হলো। "দাদার" অযাচিত করুণা,—করুণাময় তিনি।

দাদা আসবেন, দাদা আসবেন, মনের এই আবেগ নিয়ে আগের দিন রাত্রে শুতে গেলাম। সারারাত নিশ্চিন্তে মনের আনন্দে এমন ঘুমই ঘুমালাম, যখন জেগে উঠলাম বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে। নিজের মনেই লজ্জিত হোলাম। 'দাদাকে' আনতে যেতে হবে।

কয়েক দিন আমার মনে হোত ভাল করে স্নান করে, শুদ্ধ শুচি হয়ে তবে দাদার কাছে যেতে হবে।

আরে বোকা মন! স্নান কোরলেই যদি অন্তরের শুদ্ধি—শুচিতা আসতো, তবে তো এ দুনিয়া শুদ্ধ শুচিতার মহাপুণ্যে ভরে যেতো।

যাক দাদার আশীর্বাদে এখন সে ভাব কেটে গেছে।

'দাদা' আসবেন! 'দাদা' আসবেন! কি করবো না করবো জানিনা—শুধু জানি 'দাদা' আসবেন।

সময় মতন দাদাকে আনতে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যখন দাদার ঘরে পৌছালাম, স্নেহময় হাসি দিয়ে আমাকে আহ্বান করলেন। 'দাদার' সে হাসি যে কত মধুময়, যে দেখেছে সেই অনুভব করতে পেরেছে। দেহের প্রতিটি অঙ্গ যেন সেই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

"দাদাকে" প্রণাম করে ও আশীর্বাদ গ্রহণ কোরে দাঁড়িয়ে রইলাম। "দাদাও" আমাদের এখানে আসবার জন্যে প্রস্তুত; কিন্তু হঠাৎ শ্রীমতী সাবিত্রী চাটার্জীর দূত হয়ে লক্ষ্মী গুপ্তা এসে উপস্থিত। সে নাছোড়-বান্দা, পাঁট মিনিটের জন্যে "দাদাকে" সাবিত্রীর ওখানে যেতেই হবে। "দাদার" তখন ছোট বাচ্চার মতন কত যেন অসহায় অবস্থা, এই রকম ভাব।

মনে মনে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি আমি—আবার আমার পরীক্ষা চলছে।

আমি বোল্লাম—ঠিক আছে আছে "দাদা", আমাদের বাড়ীর

কাছেই তো থাকেন ওরা—পাঁচ মিনিট আগে ওদের ওখানে হয়ে তার পর না হয় আমাদের বাড়ী আসবেন।

দাদা হাসি মুখে তাকালেন —বল্লেন "তুই বল্‌ছিস্ যখন তাই চল্।" কত যেন আমার অনুমতির অপেক্ষা। অবিশ্যি পাঁচ মিনিটের জায়গায়—পনেরো মিনিট হয়েছিল সেখানে।

যাই হোক "অবশেষে এসে পৌঁছানু আসি, 'আমার দ্বারের পাশে।' "মাটির-মায়া কুটিরে—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে।

আমি আমাদের বাসস্থানকে 'মাটির মায়া' বলে থাকি।

গাড়ী থামতেই আমার স্বামী এসে "দাদাকে" অভ্যর্থনা করে নিলেন। দু'জনে-দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। মনে হোল দু'জনের যেন কত অন্তরঙ্গতা,—কতদিনের পরিচিত তাঁরা!

দু'জনের যে হাসির বিনিময় হয়েছিল, আজও সে হাসির কথা মনে পড়লে, মন আমার আনন্দ শিহরণে ভরে যায়।

বুঝলাম হাসিতেই জগৎ-মাৎ হয়ে গেছে। "দাদার" জয় সর্বজায়গায়, সর্বজগতে।

আমার ভাসুর চির কুমার। তিনিও এসে দাদার সাথে দেখা করলেন—'দাদা' তাকে বল্লেন—"তোমার তো কোন জায়গাই যাবার "দরকার নেই—তুমি নিজেই পূর্ণ।"

বাড়ীর অন্যান্য সবাই এসে "দাদাকে" প্রণাম করলে একে একে। আমার ছোট পুত্র বাপিও তখন বাড়ী ছিলো। (একটা কথা লিখতে ভুলে গেছি ; ২৯শে মে বাপির জন্মদিন ছিলো—সেদিন ভোরে উঠেই মনে মনে প্রণাম জানিয়েছিলাম আমার "বিশ্বময় দাদাকে।" সকাল বেলা দশটার সময় ডাঃ অনিল মৈত্রের বাড়ীতে যেয়ে "দাদাকে" প্রণাম করে এসেছিলো বাপি। "দাদা" ওর জন্মদিন শুনে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করে দিয়েছিলেন।)

দশ পনেরো মিনিট থাকবো বলে "দাদা" প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার

উপরে ছিলেন আমাদের বাড়ীতে।—তাঁর ছোট ভাই মিঃ গুহের সাথে এমন জমে গেলেন যে ওঠার কথা আর মনে হয় নি।

আমার বাড়ী, ঘর, দোর তখন "দাদার" অঙ্গগন্ধে সুবাসিত।

অনেকের কাছে "দাদার" চরণ জলের কথা শুনেছিলাম, কিন্তু "দাদার" কাছ থেকে তখন চাক্ষুষ সেই "অহৈতুকী কৃপা" পাই নাই।

সেদিন "দাদার" কাছে পেলাম "চরণজল" আশীর্বাদীরূপে।

"দাদা" একটা পরিষ্কার গ্লাসে আমাকে জল আনতে বোল্লেন। আমি দাদার আদেশ পালন করে তাঁর সামনে জলের গেলাসটি রেখে দিলাম।

"দাদা", তখন অন্তর্মুখ একেবারে, আত্মস্থ। মনে হচ্ছে কোন স্বর্গীয় জগতে বিচরণ করছেন। একটু পরে নিজের মাঝে নিজে ফিরে এসে, গ্লাসের জলের উপর তিনবার ডান হাতখানি সঞ্চালন করলেন! তার পর নিজ হাতে সেই আশীর্বাদী জল—আমাদের সবাইকে দিয়ে বল্লেন—"খেয়ে নাও।"

অপূর্ব, সুগন্ধযুক্ত জল, আতরের গন্ধে ভরপুর। কোথা থেকে এ গন্ধ এলো, এতো এ জগতের কোন চেনা গন্ধ নয়!

আমার স্বামী মিঃ গুহ দাদাকে বল্লেন "দাদা" আমি ধর্মভীরু নই; ধর্মাশ্রিত। "দাদা" আপনি কেন অলৌকিক দেখান, এযে আমার একটুকুও ভাল লাগেনা। দাদা তখন মুখ বিস্তারিত করে হেসে বল্লেন ["অলৌকিক বিভূতি সবার জন্যে নয়রে—যার ভেতরে যা আছে সে তা নিয়েই এসেছে। আমি তোদের দাদা, কিছু দিতে পারি নাই। তবু ও বোলছি কিছু লোকের জন্যে অলৌকিক বিভূতির দরকার আছে—আর অনেকে এটা চায়।"]

মিঃ গুহ তাঁর মনের নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন, "দাদা"ও অতি সহজে, একটুও মনে বিরক্ত না হয়ে জবাব দিতে লাগলেন। সে সময় আমি ইচ্ছা করেই সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। "দাদার" সঙ্গে

আমার স্বামীর সহজ সরল আলোচনার মধ্যে—সব কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব কেটে জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যাক্ তাই আমি চেয়েছিলাম।—আমার উপস্থিতিতে যেন কোন সংকোচ বা বাধা না আসে। মাঝে মাঝে আমি আসা যাওয়া কোরছিলাম—সব সময় উপস্থিত না থাকার দরুণ আমি সব প্রশ্ন ও উত্তর ঠিক মতন লিখতে পারলাম না—তার জন্যে সত্যিই আমার আফ্‌শোস হচ্ছে।

"দাদার" ও দাদার ছোট ভাই এর আলোচনা চলতে লাগলো—পার্থিব জগত থেকে "ঈশ্বরীয়" জগতের সব রকম ও সব কিছু।

আমি যখন ওখানে এসে বোসলাম তখন শুনলাম "দাদা" বলছেন—["তোমাদের দেহই তো মন্দির। সে মন্দির ছেড়ে কোথায় যাবে মন্দিরের খোঁজে, দেবতার খোঁজে? তিনি তোমার অন্তরেই রয়েছেন। পূজার প্রসাদ আবার কি? নিজেই তো নিজের প্রসাদ।

প্রসাদ কাকে বলে? আমাকে একটা জায়গায় বন্ধ করে দাও, আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি প্রসাদ কি। জপ, তপ, পূজা আচার এতো অহঙ্কার। যা করবে তা অন্তরে ও মনে করতে হবে। ধ্যানও করবে মনে, কেউ জানতে পারবেনা। জাত আবার কি? আমি ব্রাহ্মণ, আমি বৈদ্য, আমি কায়স্থ, আমি শূদ্র, আমি খৃষ্টান, আমি মুসলমান। সব একজায়গায় যেয়ে সব সমান। জগতে কেউ বড়ও নয়, কেউ ছোটও নয়। আমার কাছে বিড়লাও যেমন বস্তির লোকও তেমন। কোন প্রভেদ নাই। আচার আচরণ জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ভেক ত্যাগের কোন দরকার নেই। আনন্দ করবে, আনন্দে থাকবে ও আনন্দ রাখবে। তোমার মধ্যে যে জন আছেন, আমার মধ্যে সেই একজনই আছেন। আমরা সব এক আলাদা কিছু নয়।

গীতার শ্লোক কি, গীতার ব্যাখ্যা কি, কয়জনে বুঝতে পারে। "ধর্ম ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র মানে কি? ধর্মক্ষেত্র হচ্ছে তোমার মন, কুরুক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে তোমার ইন্দ্রিয়াদি—তারই সাথে যুদ্ধ।

তীর্থ একটা, সেটা দেহ তীর্থ—তবুও আমরা দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াই। সচল ছেড়ে অচল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি। সাথী তো সচলই। তাঁকে নিয়ে আনন্দ কর।

[সংসার ছেড়ে কোথায় যাবে। মহাদেব তো পূর্ণ যোগী ও পূর্ণ সংসারী ছিলেন। ছেলে মেয়ে সব নিয়েই সংসার করে গেছেন। যাগ যজ্ঞ তো নিজে, প্রসাদ তো নিজেই।"]

আমার স্বামী জানতে চাইলেন এত বীর স্বামীরা থাকতে দ্রৌপদীকে কৌরবের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হোল কেন ?

দাদা বল্লেন—

["দ্রৌপদীর অহঙ্কার হয়েছিল, স্বামীরা এত বীর ছিলেন ভেবে। যতক্ষণ নিজের ভুল বুঝতে না পারলেন ও তাঁর শরণাগত না হলেন—ততক্ষণই তাঁর লাঞ্ছনা। দর্পহারা শ্রীহরি এই ভাবে তাঁর দর্প হরণ করলেন।"]

"দাদা" এই রকম কত অমৃতময় কথা বল্লেন। আমার মতন স্বল্পজ্ঞান নারীর পক্ষে, সব মনে রাখাও সম্ভব নয়। আমি আর আমার স্বামী দু'জনেই দাদার সামনে—বসেছিলাম। মাঝে মাঝে উনি দাদাকে প্রশ্ন কোরছিলেন সব প্রশ্নেরই এত সুন্দর ভাবে উত্তর দিচ্ছিলেন ও বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন আধ্যাত্মিক বিষয়ের, যে মনের সব সমস্যা মিটে যাচ্ছিল।

আমার মন আনন্দে পুলকে ভরে উঠছিলো,—আর ভাবছিলাম "তোমার কাছে যাবার পথ তুমিই সুগম করে দিয়ে গেলে 'দাদা'।"

দাদা এর মধ্যে সময় জানতে চাইলেন—সময় জেনে আমার স্বামীকে বোল্লেন "এবার যে আমার উঠতে হবে ভাই। আমাকে এবার বিদায় দাও।" সেদিন সব স্নেহ, সব ভালবাসা আমার স্বামীর জন্যেই সঞ্চিত ছিলো।

দাদা রওনা হবার আগে—পরম ভক্তিভাজন "দাদাকে" প্রণাম

করে বোল্লাম "দাদা" ভাই, আমি জগতের কোন কামনা বাসনা নিয়ে তোমার কাছে আসিনি, একমাত্র কামনা অন্তরে শুদ্ধা ভক্তি ও পূর্ণ বিশ্বাস যেন পাই। আর তাঁর পরেই যেন পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে পরম নির্ভর করে থাকতে পারি।

পরম আশ্রয় "দাদা" অন্তরঙ্গ সুরে বল্লেন "জানিরে, সব জানি। আশীর্বাদ করি যা চাইছিস. তাই পাবি।"

"দাদা" উঠে দাঁড়ালেন যাবার জন্যে। আমার বাড়ীর সবাই এসে "দাদাকে" প্রণাম করলেন। "দাদাকে" আবার আমি প্রণাম করে বোল্লাম—

"দাদা" আমার একটা আর্জি আছে!"

দাদা বল্লেন—"কি আর্জি বল।"

আমি বোল্লাম "আমার যদি এ দেহ ছেড়ে যাবার সময় হঠাৎ উপস্থিত হয়, তখন আপনি কোন মতেই আমাকে টেনে রেখে বাঁচবার চেষ্টা করবেন না, কথা দিন—যা আপনি করেন নিজের উপরে নিয়ে ভক্তদের জন্যে। আর আমার শেষ সময়ে আপনি যেখানেই থাকুন "আপনাকে" আমি আমার সামনে "দৈহিক রূপে" যেন পাই ও অন্তরে পাই যেন "ঐশ্বর্য্যময় রূপে"—এই আমার আর্জি "দাদা"।

"দাদা" বল্লেন—"তাই হবে রে তাই হবে।"

মনোময় স্বর্গ রাজ্য রচনা করে "দাদা" এতক্ষণ বসে ছিলেন আমাদের সাথে নিয়ে। "দাদা" রওনা হয়ে গেলেন কিন্তু সেই পরিবেশের আবেশ নিয়ে বসে রইলাম অনেক্ষণ। আমার স্বামী শুধু একবার বল্লেন "সত্যিই মহাযোগী।"

বুঝলাম তার মনে আর কোন সংশয় নেই। মনে মনে যুক্তকরে প্রণাম জানালাম।

হারা জেতার পরীক্ষা পরীক্ষা খেলায় "তুমি" "আমি" দু'জনেই জিতে গেলাম "দাদা"।

আরে অবোধ মন, এই বিরাট বিশ্ব নিয়ে যিনি নিজের ইচ্ছা মতন খেলা করে চলেছেন, তাঁর আবার খেলায় হারা আর জেতা। হারও যেমন সত্য, জয়ও তেমন সত্য—দুই-ই সমান তাঁর কাছে।

দাদা ভাই! অতিমূর্খ আমি। আমরা নিজেরা যে কিছুই করতে পারি না, সবই যে তাঁর অঙ্গুলি হেলনে চলছে, সে বোধ হোল কই! অন্ধের মতনই শুধু মানুষ পুতুল মোরা হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছি,—তোমার খেলার পুতুল হয়ে। তবু কত অহমিকা, কত অহঙ্কার, কত দর্প।

সে অহমিকার শেষ কর ঠাকুর! খেলার ছলে, কেবলি দূরে সরে যেও না, অন্তরে এসে ধরা দাও প্রভু,—শিখিয়ে দাও, জানিয়ে দাও বুঝিয়ে দাও, কি করে অন্তরের অন্তরতমের কাছে পৌঁছাতে পারি! তুমি সেই আশীর্বাদই করো প্রভু!—

তোমাতেই শরণ নিলাম।

[২রা জুন।—]

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় "দাদা" আমাদের বাড়ী থেকে রওনা হয়ে যাবেন বলে বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেই সময় আমার ছোট ছেলে বাপিও এসে দাঁড়ালো স্কুটার নিয়ে কাজে যাবে বলে।

রওনা হচ্ছেন "দাদা" একটু দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞাসা কোরলেন—

"কিরে কাজে যেতে হবে নাকি?" বাপি বল্লে—"হ্যাঁ কাজে যাচ্ছি" —"দাদা" বল্লেন—"আচ্ছা যা।"

বাপি স্কুটার নিয়ে রওনা হয়ে গেলে, "দাদা" একটু চুপ করে আত্মস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হোল, মনে মনে তিনি বাপির মঙ্গল কামনা করলেন। "স্নেহময় দাদার" স্নেহ তো সবারই জন্যে।

"কিছু পেলে কিছু দিতে হয়" এই কথাটা আমি আগেও বলেছি

এখনও আবার বোলছি। সংসারে পরীক্ষার পর পরীক্ষার তো আর শেষ নেই।

তাই সেদিন দুপুরে আমার ছোট শ্রীমান স্কুটার দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পড়লো। যা হতে পারতো, "দাদার" আশীর্বাদে অনেক অল্পের উপর দিয়ে কেটে গেলো। মাইনর ব্রেন কংকাশন।"

এই খবর শুনে অনেকেই আমাকে বল্লেন "দাদাকে" বলো।— আমি বোল্লাম "না, না, এর জন্যে আমি "দাদাকে" বলতে পারবে না "তিনি" যদি আসেন নিজে বুঝেই আসবেন। আমি কি বলবো? "দাদা" আমার ছেলেকে ভাল করে দাও! তা আমি পারবো না।"

সত্যিই সেদিন রাত্রেই "দাদা" ফোন করলেন, বল্লেন—

"চিন্তার কিছু নেই, ভাল হয়ে যাবে।" অন্তরে "দাদার" সেই কথাটাই মেনে নিলাম। আর "দাদাকে" উত্তরে বোল্লাম—

"দাদা" চিন্তা কিছু কোরছিনা, তিনি যেমন রাখবেন।" মনে হোল দাদা আবার আমাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেল্লেন। শুধু আমার কথার গর্ব কিনা পরখ করতে, এই ঘটনায় বিচলিত কিনা তাই দেখতে। মনে সত্যিই আমার দুশ্চিন্তা ছিল না, কিন্তু সেবা বা কর্তব্যের ত্রুটি কোরছিলাম না। সেদিন রাত্রে বার বার বাপি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও আমি সবই তাঁর ওপর নির্ভর করে ছিলাম।

দাদার ফোন পেয়ে মনের মধ্যে পরম নিশ্চয়তা বোধ করতে লাগলাম। শরণাগত, শরণাগতা আমি বিপদে যেন ধৈর্য্যহারা না হই প্রভু। অন্তিমকালে যেন তোমার পাদপদ্মে মাথা রেখে অন্তরের একটি প্রণাম জানাতে পারি,—

হে শরণাময়—

শরণ দিও শরণনাথ
দীনের নাথ, দেখাও পথ।

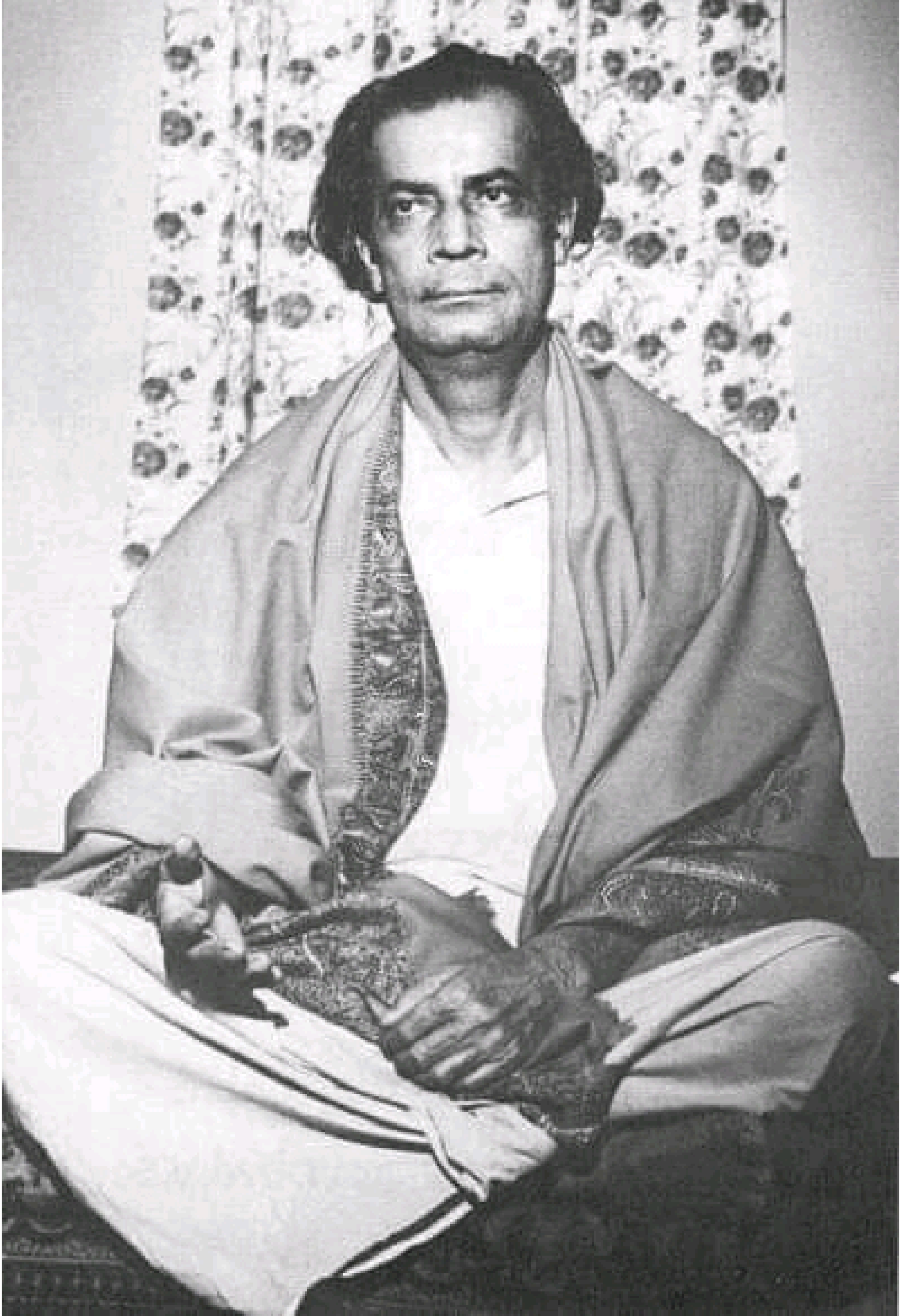

স্মরণের শরণ তুমি
তুমি শরণময়।
তোমাতে লয়েছে স্মরণ
দাও সবে অভয়।
শরণাগত স্মরণ করে
শরণ দিও তারে।
তোমার নামের ক্ষুধা
পরম অমৃত সুধা
বিলাও অমৃত ধারে।

———

[৪ঠা জুন, বুধবার, ১৯৬৯ সাল। সকাল সাড়ে সাতটায়, আমার "মাটির মায়া" কুটিরে "দাদার" পুনরাগমন। ৮ম দর্শন।]

হে করুণাময়! তোমার করুণা আমরা কি বুঝতে পারি বলতো? কিছুই যে আমরা পারি না। তোমার অযাচিত করুণাধারা উপলব্ধি কোরবার বুদ্ধি বা শক্তি আমাদের কোথায়? মন তো সংশয়ে ভরা—সংশয়ের দোলায় সব সময়ই হেলে দুলে বেড়াচ্ছি আমরা, অস্থির চঞ্চল মন স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চায় না,—সবই মায়ায় ও ছায়ায় ঘিরে রেখে দেয়। তবুও পরম করুণাময় তিনি, তাঁর করুণার শেষ নেই।

দাদা নিজেই বাপিকে দেখতে এলেন! অত্যন্ত স্নেহ করুণ অন্তরের স্পর্শে, চরণ জল দিয়ে বাপির সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিলেন। এই ছেলেটি আমার দামাল ছেলে। মনে মনে কিছু অনুভব করলেও মুখে কিছুতেই মানতে চায় না—দাদার সামনে সে চুপ করে শান্ত হয়েই শুয়ে রইলো।

"দাদার অপরূপ কল্যাণরূপ। স্নেহ বিগলিত নয়নে ওর দিকে চেয়ে কল্যাণ কামনা করলেন।

"ধন্য তুমি "দাদা ভাই" আমার, প্রতিজনে তোমার সমস্নেহ। এ স্নেহের তুলনা নেই, এই স্নেহের করুণাধারা বুদ্ধির অগোচর। তোমার স্নেহ ধারার বন্যায় প্লাবিত করে নিয়ে যাচ্ছে সবাইকে।

ওগো স্নেহময়। ওগো দয়াময়, তোমার মর্যাদা যেন আমরা বুঝতে পারি, কখনও হারিয়ে না ফেলি, মিশিয়ে না ফেলি তোমাকে জীবনের সুখে, দুঃখে।

বাপির ঘর থেকে বেরিয়ে দাদা এসে বস্‌লেন বাইরের ঘরে। তাঁর অঙ্গসুবাসে সারা বাড়ী ঘর আমোদিত।

"দাদা" অন্তর্মুখ, আত্মস্থ হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ, তারপর আমার স্বামীকে বল্লেন—

["তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে, অতি সজ্জন, অতি সুন্দর।" তবে জাগতিক জীবনে তোমার সুখ হবে না, হোতে পারে না, তোমাদের মতন সৎলোকের।"]

আমার স্বামী বললেন "আমি জানিনা "দাদা", আমি ভাল কি মন্দ। সততার সাথে নিজের কাজ করে যেতে চেষ্টা করি এই মাত্র। আশীর্বাদ করবেন শেষ পর্যন্ত যেন, এই ভাবেই চালিয়ে যেতে পারি।"

"দাদা" আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বল্‌লেন "আঃ, এত ভাল।"

আমি অভিমান দেখিয়ে বোললাম "হ্যাঁ সব ভাল, কেবল আপনার ভাই—আমি মোটেই ভাল নয়—।" "দাদা" হেসে আমার দিকে তাকালেন।

কত মান, কত অভিমান তোমার সাথে "দাদা"। জাগতিক জগতে যখন দেহ ধরে এসেছ, এ জীবনে তুমি আমার "দাদা ভাই" হয়েই থাকো,—আমি তোমার ছোট বোনটি হয়ে যেন, তোমার আশে

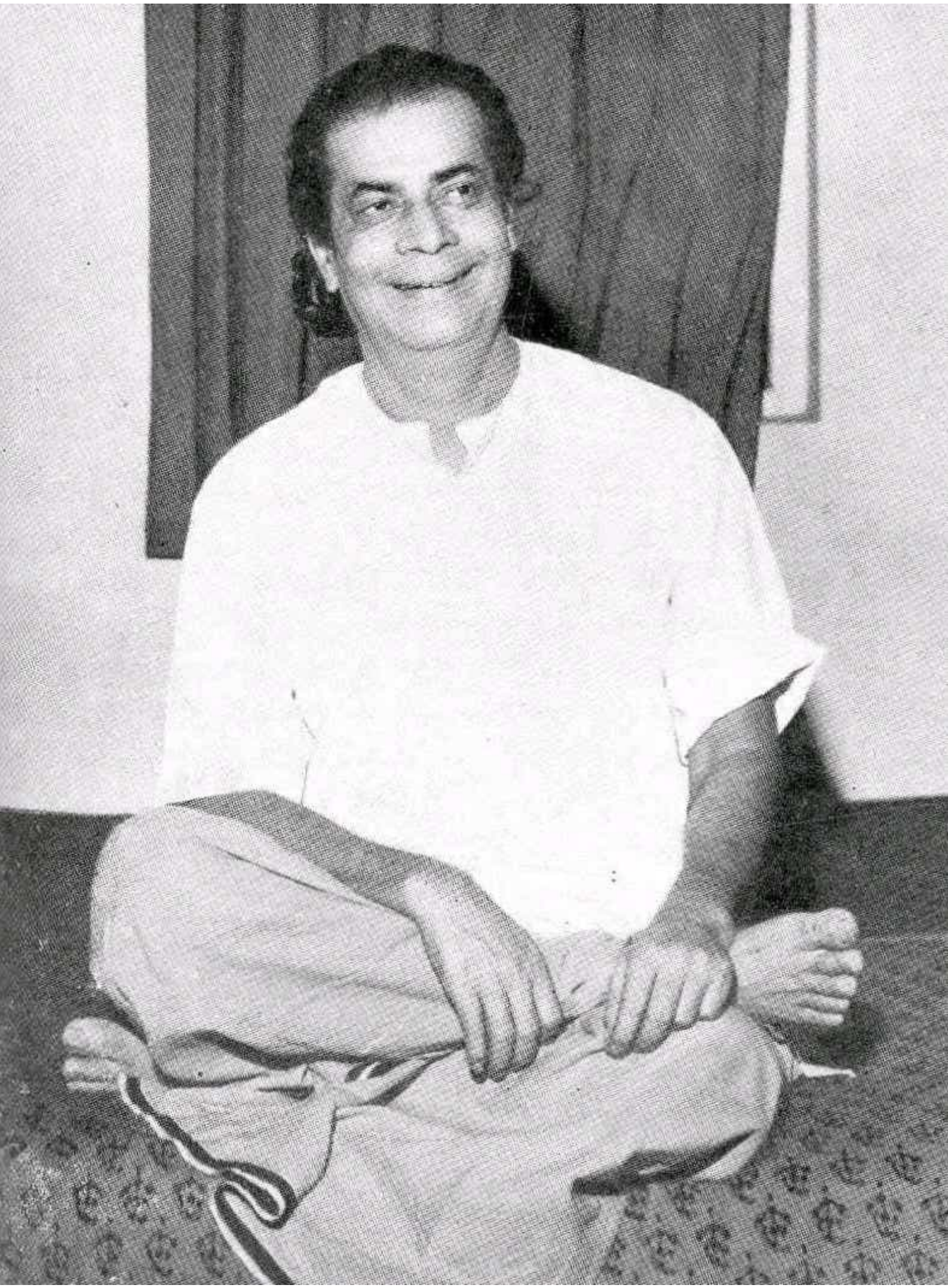

পাশেই ঘুরে বেড়াতে পারি, তোমার স্নেহ ভালবাসা সবার সাথে এক সাথে কুড়িয়ে।

দাদা চলে গেলেন, রেখে গেলেন অঙ্গগৌরব সুবাস ও আনন্দের প্রদীপ। যে অনির্বাণ আনন্দের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন, তার জ্যোতির্ময় শিখা আমাদের জীবনে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠুক "আনন্দময়ের" কাছে সেই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

———

[৮ই জুন, রবিবার, ১৯৬৯ সাল সময় সন্ধ্যা ৬টা শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গুপ্ত মহাশয়ের বালীগঞ্জ প্লেস এর বাড়ীতে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা। নবম দর্শন]

বেশী যে চায় সে কিছুই পায় না, একটা কথা আছে না? আমার বেলাতেও সে কথাটা প্রযোজ্য। আমার অবস্থা তখন সেই রকমই। ফোন করলে "দাদা" তখন তাঁর ভাইকে অর্থাৎ আমার স্বামীকে চান। আমি তখন দাদার নজরের বাইরে।

৭ই জুন সন্ধ্যাবেলা ফোন করে দাদা ওঁর সাথে কথা বল্লেন ও মিঃ গুপ্তের বাড়ীর পূজাতে যাবার জন্যে নিশ্চয় করে আসতে বল্লেন। আমার সঙ্গে কিন্তু কোন কথা কইলেন না।

মনে মনে আমি হাসছিলাম, এই ভেবে যে দাদা ঠিক জায়গাই বেছে নিয়েছেন। আমি তো ছোট বোন, বললেও যাবো, না বোললেও যাবো, দাদা সেটা ভাল করেই জানেন।

৮ই মে সন্ধ্যা ৬টায় গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে যেয়ে পৌঁছালাম আমরা। নীচে মিঃ বি. সি নাগ দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের স্বাগত জানিয়ে উপরে যেতে বল্লেন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যেতেই "দাদার" হাসিভরা মুখখানা দেখতে পেলাম।

"দাদা" হেসে আমাদের ডেকে পাশে বসতে বল্লেন। আমরা ঘরে ঢুকে প্রণাম কোরলাম "দাদার" শ্রীপাদপদ্মে।

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন "দাদার" দৃষ্টি তাঁর ছোট ভাই, মিঃ গুহের উপরেই ছিল—কারণ সেইদিনই প্রথম তিনি মনে কোন সংশয়ের ছায়া না রেখে, অম্লান হৃদয়ে, অতি আগ্রহের সাথে যোগ দিয়েছিলেন পূজাতে।

ধন্য তুমি "দাদা", ধন্য তোমার স্নেহ। তোমার স্নেহের পরশে সব সংশয়ের ছায়া "তুমি" অপসারণ করে, নিজের কাছে অতি আদরে টেনে নাও। স্নেহের ফল্গুধারা তোমার অন্তরের অন্তঃস্থলে অন্তঃসলিলার মতন সর্বদাই প্রবাহিত।

আমার স্বামী চুপ করে বসে ছিলেন। আমি মাঝে মাঝে "দাদার" সাথে ও চেনা পরিচিত কেউ এলে তাঁদের সাথে কথা বলছিলাম।

"দাদা" মাঝে মাঝেই আত্মস্থ হয়ে যাচ্ছিলেন ও আমাদের বোলছিলেন "দেখ উষাদি এলেন।" "দেখ মিনু এলো" "দেখ কল্যাণ সিন্‌হা এলো"—সত্যি দাদার বোলবার ২ মিনিটের মধ্যে তাঁরা সবাই এসে উপস্থিত হোচ্ছিলেন।

আমরা অবাক হয়ে ভাবছিলাম "দাদা" দোতলার ঘরের একপাশে বসে, কিভাবে সব জানতে পারছেন? মন ও বুদ্ধির অগোচরে যে জিনিষ সে সব নিয়ে চিন্তা না করাই ভাল—"দাদার" খেলা "দাদাই" জানেন।

মঞ্জু, শ্রীযুক্ত কল্যাণ চক্রবর্তীর স্ত্রী এই সময় ঘরে ঢুকলেন। "দাদা" ওকে কাছে ডাকলেন,—তারপর হাত উঁচু করে হাতের মুঠোর থেকে কি একটা জিনিষ মঞ্জুর হাতে দিলেন। পরে দেখলাম "সন্দেশ" সেই অপার্থিব সন্দেশ, কোথা থেকে এলো? যে জানাবার তিনিই জানাবেন। "ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার প্রকাশ।" সেটুকু যেন উপলব্ধি করতে পারি, সেই আশীর্বাদই ভিক্ষা করি।

সেদিনকার কিন্তু সব উপলক্ষ্য মিঃ গুহ। তবুও দাদা দুষ্টমি করে মঞ্জুকে বললেন—

["আজকের সন্দেশটা, রেণু দিদির নামেই পাঠিয়েছেন তিনি—তাই মিঃ গুহকে (পরিমলকে) ও রেণুকে আগে প্রসাদ দিয়ে, সবাইকে দাও।"]

এ যেন ছোট বোনকে সান্ত্বনা। সর্বজনপ্রিয় "দাদাকে" যদি একটুও জানবার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন "উনি", তবে তার থেকেই বুঝতে পারি "ওঁর" কাছে সবাই সমান।

ছাদে বোসবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। পূজার ঘরও ছিলো ছাদেই। পূজাতে বোসবার আগে ছাদে যাবার সময় মিঃ গুহকে "দাদা" সাথে ডেকে নিয়ে গেলেন,—আমরাও সবাই ছাদে গেলাম।

ছাদে কীর্তনানন্দে ও নাম গানে সবাই বিভোর হয়ে রইলাম।

পূজার সেই স্বর্গীয় পরিবেশ, সত্যিই মনে হয়, স্বর্গ বলে যদি কিছু থাকে তো মর্ত্যে নেমে এসেছে,— তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন, দিব্য জ্যোতি, অপরূপ কান্তি, নরনারায়ণ রূপে, 'সত্যনারায়ণ' করিতে জগতে উদ্ধার।

পূজা-অন্তে সবাই দাদাকে প্রণাম কোরলাম। মিসেস বি. সি. নাগ প্রণাম শেষে বল্লেন "দেখুন আমার হাতে কি বকুল ফুলের গন্ধ। "দাদার" পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরবার পর এই গন্ধ পেলাম। এর ব্যাখ্যা কি কথায় চলে? না আমাদের মতন লোকেরা বুঝতে পারে?"

সত্যিই ওর হাতের থেকে ঘ্রাণ নিয়ে জানলাম ভূর ভূর করছে বকুল ফুলের গন্ধ।

সেদিন দাদার ওখানে পূজায় যেয়েও মনটা আমার খুবই উচাটন্ ছিলো; কারণ আমার ছেলের দুর্ঘটনার খবর সবাই নিচ্ছিলেন।

সৌজন্যতার খাতিরে আমার কথার উত্তর দিতে হোচ্ছিল। সেই জন্যে সেদিন পূজার সময় মনটা আমার মগ্ন হোতে পারে নি।

আমার ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটি, বিচ্যুতি সবই আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি "দাদা"। তার জন্য আমার প্রাপ্য শাস্তি যদি কিছু থাকে মাথা পেতে নেব।

সেদিন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরবার দরকার থাকাতে, পূজা শেষে "দাদাই" আমাদের বললেন "দেরী করিস না, যা তোরা রওনা হয়ে পড়।"

আসবার আগে আমরা যাতে পূজার প্রসাদ পাই তার জন্য "দাদার" কি ব্যাকুলতা. মায়ের যেমন সন্তানের জন্যে জন্যে ব্যাকুলতা।

তুমিই আমাদের "দাদা"। তুমিই আমাদের পিতামাতা, ভাই বন্ধু। তুমিই আমাদের পরম স্বামী, পরম স্ত্রী, পরম প্রিয়জন— একাধারে সবই "তুমি', তুমি আমিময়।

এক সাথে মিলে মিশে হয়েছ সর্বজন প্রিয় "দাদা"। আদরের "দাদা"।

তোমারে জানাই আমাদের প্রাণের সুরের মিলিত শুদ্ধা ভক্তি প্রণাম।

[৯ই জুন সোমবার, ১৯৬৯ সাল।]

৯ই জুন খুব ভোরে আমার বড় ছেলে গৌতম, সস্ত্রীক বাচ্চাদের নিয়ে পুণা থেকে, কোলকাতায় এলো ছুটিতে। সে একজন এয়ারফোর্সের অফিসার। রোজই তাকে প্লেন নিয়ে উড়তে হয়। ছোট বেলার থেকেই "ঐশ্বরিক শক্তির" উপর তার অগাধ বিশ্বাস। তাদের সব সময়ই হিমালয় পর্বতের উপরে, ভেতরে, আশে পাশে ফ্লাইং করতে হয়। 'হিমালয়কে' সে পরম শক্তির আধার বলে মনে করে।

সে মনে করে,—হিমালয়ের ইচ্ছা না থাকলে কেউ নাকি ওখান থেকে প্লেন নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না।

হিমালয় পর্বতের, সেই স্তব্ধ, গম্ভীর বিরাট-মূর্তি মনে এনে দেয় অসীম শ্রদ্ধা। হিমালয়ও নাকি "ইচ্ছাময়", এই গৌতমের অখণ্ড বিশ্বাস।

গৌতম কিন্তু ভীরু নয়। সে মৃত্যুকে মৃত্যু বলে, বিপদকে বিপদ বলে গ্রাহ্যই করেনা। সব সময়ই বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। সেজন্যে এয়ার ফোর্সে ওর আর এক নাম "স্পিডি"।—বিপদ সঙ্কুল কোন কাজ আসলে সে সব সময় আগেই এগিয়ে যায়।

"দাদার" কথা শুনে সে "দাদাকে" দেখবার জন্যে অস্থির। "দাদাকে" সে কথা জানানোতে 'দাদা" বললেন—

"বেশ তো তোর ওখানে আমি নিজেই যাবো।"

আমি বোল্লাম "মাধুকে নিয়ে আসবেন দাদা"! দাদা রাজী হয়ে গেলেন।

আমরা "দাদা" আসবেন বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে মনে ভাবলাম—

কোথা তুমি খুঁজিছ ঈশ্বর,
সমুখে দাঁড়ায়ে আছেন মহেশ্বর।

[১৩ই জুন, শুক্রবার ১৯৬৯ সাল, সকাল ৮-৩০ মিনিটে "মাটির মায়া" কুটিতে "দাদার" আগমন।—দশম দর্শন।]

১৩ই জুন সকাল ৮॥০ টার সময়, মাধুকে নিয়ে দাদা নিজেই এলেন তাঁর রথ চালিয়ে।

গৌতম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কোরছিল। দাদা আসতেই ভক্তিভরে প্রণাম কর্‌লো।

"দাদাও", গভীর আগ্রহে স্নেহময় দৃষ্টিতে তাকে কাছে টেনে নিলেন। আর ওদের কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

হিমালয়ের ভেতরে প্লেন নিয়ে যাওয়া আসার কথা ও হিমালয় সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাসের কথা গৌতম "দাদাকে" জানালো।

["দাদা" গৌতমকে বললেন—"তুই ঠিকই বলেছিস্, অতি সত্য তোর উপলব্ধি।"] আর আমাকে ডেকে বললেন, "রেণু শোন তোর ছেলে কি বলে! বড় ভালোরে।'

আমি মনে মনে ভাবলাম "দাদা দুনিয়ার সবাই তোমার কাছে ভালো ;—খারাপ আর তোমার কাছে কে ?"

আমার পুত্রবধূ অরুণা ও আমার ২টি নাতিকেই "দাদা" আশীর্বাদ করলেন। দাদাকে বোল্‌লাম "'দাদা' এই আমার বালগোপাল তোমার মধ্য দিয়েই পেয়েছি।"

কিছুক্ষণ বাদেই "দাদা" বিদায় নিলেন, রেখে গেলেন, আশীর্বাদী চরণ জল ও সুগন্ধ সুষমা। মনে মনে বোললাম "আবার তুমি এসো দাদা"

গৌতম তো দাদাকে দেখে দাদার কথা শুনে অভিভূত। সারাদিন সে দাদার কথা নিয়েই মেতে রইলো। সে জোর গলায় প্রকাশ করলো—"দাদা" অতি উঁচু স্তরের যোগী, ঈশ্বরের মহা আর্বিভাব "দাদার" মধ্যে, ততে নাকি ওর কোন সন্দেহ নেই।

গৌতমের কথা শুনে, আমার মনও আনন্দে ভরে উঠলো। মনে মনে "দাদাকে" প্রণাম জানালাম। "মায়ের মন" পরে "দাদাকে" জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আমার বড় ছেলেকে কেমন লাগলো।" "স্নেহময় দাদা" যে কথাটি বল্লেন, দাদার সেই বাণী, নিভৃত আমার অন্তরেই থাক।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

সেদিনের একটি কথা লিখতে ভুলে গেছি—"দাদা" আমাদের বাড়ী পৌঁছবার পর দেখতে পেলাম, দাদার গলার 'গ্লাণ্ড' ফুলে শক্ত হয়ে রয়েছে। মাধু বল্‌লে "দাদা" নাকি শ্রীযুক্ত বিভূতি সরকার মহাশয়ের গলার কষ্ট নিজের উপরে টেনে নিয়েছেন তাই এই অবস্থা।

"দাদা গো" সবার রোগের জ্বালা নিজের মধ্যে নিয়ে বসে আছ বিভূতিময় হয়ে। তোমার "চিকিৎসা বিভূতি," জগত বিখ্যাত চিকিৎসকদেরও বুদ্ধি ও বিচারের বাইরে। হে মহাচিকিৎসক তোমায় প্রণাম।

[১৪ই জুন, শনিবার ১৯৬৯ সাল। সময় সন্ধ্যা ৭টা। মিঃ কল্যাণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে দাদার সাথে—একাদশতম দর্শন।]

১৪ই জুন শনিবার দিন মিঃ কল্যাণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে দাদার আদেশে গিয়েছিলাম।

মিসেস মঞ্জু চক্রবর্তী অতিশয় ভক্তিমতী ও অপূর্ব কণ্ঠের অধিকারিণী। মঞ্জুর স্বভাবের গুণে দাদার অতি প্রিয়পাত্রী, দাদা ওকে আদর করে সখী বলে ডাকেন। ওদের বাড়ীর সবারই কল্যাণ-কামনায় প্রতি শনিবার দাদা ওদের ওখানে পূজায় বসেন।

দাদা ১৩ই জুন শুক্রবার, আমাদের বোলেছিলেন শনিবার দিন মঞ্জুর বাসাতে আসতে।

১৪ই জুন সকাল থেকেই মনে মনে ইচ্ছা ছিলো সুন্দর সুগন্ধ, সাদাফুলের মালা পরিয়ে দেবো দাদার গলায়। সুগন্ধের আকর যিনি তাঁরই জিনিষ তাঁকে দিয়ে মনের বাসনা মেটাবো।

যাবার পথে ফুলের মালা কিনে নিয়ে যাবো মনে কোরছিলাম, কিন্তু বাড়ীতে অনেকে আসাতে আমাদের রওনা হতে দেরী হয়ে গেলো। তাই মার্কেটে না গিয়ে সোজা মিঃ চক্রবর্তীর বাড়ীর দিকে

রওনা হোলাম, দেরী হয়ে যাবে বলে, "দাদা" পূজায় বসবার আগে পৌঁছাতে পারবোনা বলে। ফুলের মালা নিতে পারলাম না—মনে মনে দাদাকে ভেবে বোল্লাম "দাদা তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে।"

মঞ্জুরা তিন তালাতে থাকে। গাড়ী থেকে নেমে সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ে এসে দাঁড়াতেই সুন্দর, সুমিষ্ট গন্ধ এসে নাকে লাগলো।

কি ব্যাপার ভাবছি দাদার অঙ্গগন্ধ নাকি। ভাবতে ভাবতে উপরে উঠছি। দোতালায় উঠেই দেখি ল্যাণ্ডিং এর মধ্যে একজন ফুলওয়ালা মালী ঝুড়ি করে ফুল নিয়ে বসে আছে। ফুলের সাথে রয়েছে চারটি ফুলের মালাও।

"ইচ্ছাময় তোমার ইচ্ছা তুমিই জান। আমার মনের বাসনা পূর্ণ কোরবার জন্যেই কি, তুমি ফুলের মালিক হয়ে ও ফুলমালী হয়ে বসেছিলে? আমি সামান্য সংসারী নারী, তোমার বিচার কোরবার শক্তি বা ক্ষমতা আমার নেই।"

তাজা ও খুব সুন্দর যুঁই ও বেলফুলের গোড়ের মালা পাওয়া যাওয়াতে দুটো মালা কিনে নিয়ে হর্ষিত মনে উপরে উঠে দাদার মালা গলায় পরিয়ে মনের সাধ ও বাসনা পূরালাম। লীলাময় দাদার কাছে আমার মনের কথা জানালাম।

দাদা অতি নিরীহ ভাবে হেসে বল্লেন "শোন্, শোন রেনুর কথা শোন্। ওর নাকি আমার গলায় মালা পরাবার ইচ্ছা হয়েছিল, আবার বলছে দোর গোড়ায় মালা পেয়েও গেলো, শোন ওর কথা।" এই বলে অসীম স্নেহ ভরে হাসতে লাগলেন মন তখন আমার আবেগে পরিপূর্ণ মনে মনে ভাবলাম—

"রঙ্গময়! কত লীলাময় রঙ্গই তুমি জান! ওসব কথায় আর ভুলছি না। যতই তুমি ভুল পথে নিয়ে যেতে চাইবে, ততই তোমার পা জোরে আকড়ে ধরবো। আমার সাথে তাহলে তোমাকেও সেই পথে যেতে হবে, কিছুতেই ছাড়ছিনা তোমায়।'

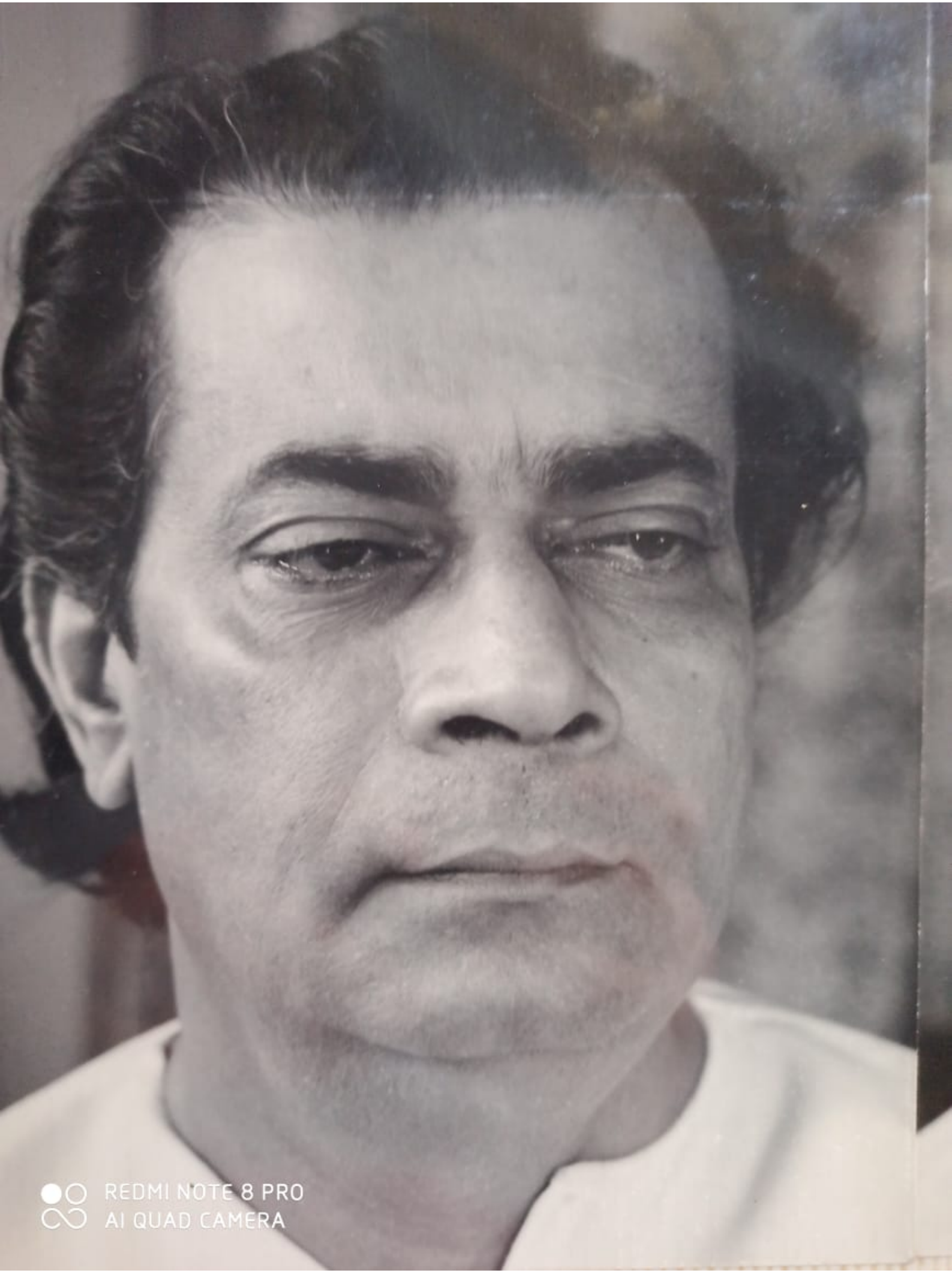
REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

ঘরে দেখলাম একটা হারমোনিয়াম পড়ে আছে। মঞ্জুর ছোট মেয়ে গোপালী বল্‌লে আর একটু আগে এলে, দাদার গান শুনতে পারতেন। আজও পর্যন্ত দাদার গান শুনবার সৌভাগ্য আমার হয় নি।

একটু পরে দাদা পূজার ঘরে ঢুকলেন। পূজা শেষে দেখলাম সেই অপূর্ব, অপার্থিব পরিবেশ। জ্যোতির্ময় রূপে তাঁরই আবির্ভাব।

পূজা শেষে "দাদার" দিব্য কান্তি, অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মনে হয় অসীম শক্তিময়ের শক্তির তরঙ্গের প্রবাহ, আমাদের মনে প্রাণে অন্তরে এসে দোলা লাগে—অপূর্ব আনন্দে মন প্রাণ ভরে ওঠে, অন্তরে হয় শক্তির সঞ্চার।—দাদা বলেন—যোগাবস্থায় সত্যকে আয়ন করাই হোল সত্যনারায়ণ। দাদাভাই তাইতো শক্তির তরঙ্গ সবার মধ্যেই বিলিয়ে দিতে চান—সবাইকে মিনতি কণ্ঠে ডাকেন "ওরে আয় তোরা আয়। আমার মধ্যে যা আছে তোরা লুটে নিয়ে যা।—আমি যে আমার ভাণ্ডার নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিতে চাই।"

"হে শক্তিময়, তোমার শক্তির প্রবাহে প্লাবিত কর সকলের হৃদয়। মূঢ় অবচেতন মনের অন্ধকার দূর করে শক্তির সঞ্চার কর প্রভু!

বাড়ী ফিরে এলাম হরষিত পুলকিত অন্তরে বার বার তাঁরই পায়ে প্রণাম জানিয়ে।

১৫ই জুন, রবিবার ১৯৬৯ সাল। সকাল ৮টা, দাদার ভবনে আমর দ্বাদশতম দর্শন।

১৬ই জুন ভোরে ঘুম থেকে জেগেও আগের দিনের পূজার আবেশ নিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলাম। মনে হয় এই একটি জায়গা আছে যেখানে চুপচাপ শুয়ে মনের অন্তরে নানারকম চিন্তা ভাবনা নিয়ে খেলা করা যায়। ঘুম ভাঙ্গলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে বরাবরই দেরী হয় সেজন্যে।

বাড়ীর সামনে গাড়ী থামবার আওয়াজে বিছানা থেকে উঠে দেখলাম, আমার 'ভাইপো' আশীষ এসেছে। তখন সকাল ৭টা হবে।

আমি ওকে জিজ্ঞাসা কোরলাম, কিরে এত ভোরে। আশীষের ভোর হয় পাঁচটায়, কারণ সে ঘোড়ায় চড়তে যায়, পোলো খেলতে যায়। আশীষ বললে এই এসে পড়লাম—ভোর কোথায় এখন তো বেলা হয়ে গেছে।

আমি ওকে বোল্‌লাম তুই যখন এসেছিস চল তোকে একজনের কাছে নিয়ে যাই। তিনি আমার "দাদা"—সবারই দাদা।

আমার ছোটছেলে 'বাপি' মুখে মুখে "দাদার কথায়" খুব বিরোধ জানায়, কিন্তু মনে মনে দাদাকে খুবই মানে, প্রকাশ করতে চায় না, আর প্রতি কথায় আমার নামে "দাদাকে" নালিশ জানাবো বলে ভয় দেখায়। যদি দাদাকে নাই মানবে, তবে সব সময় দাদার কথা মনে আসবে কেন?

আশীষ আর বাপির মধ্যে কি কথা হোল জানিনা, কিন্তু দু'জনেই দাদার কাছে যেতে রাজী হয়ে গেলো।

আমরা বাড়ীশুদ্ধ সবাই প্রস্তুত হয়ে দাদার বাড়ীর দিকে রওনা হোলাম।

"দাদার" বাড়ীতে এসে দেখলাম "দাদা নিজের মহিমায় নিজেই সমাসীন। "দাদার" ঘর ভর্তি—অনেক জ্ঞাণী গুণী জন সেখানে উপস্থিত!

আমরা দরজায় দাঁড়াতেই সেই চির সুস্মিত হাসি দিয়ে দাদা আমাদের আহ্বান করলেন। আমাদের সবাইকে "দাদা" জানতেন। "দাদাকে" প্রণাম করে, আশীষ নূতন গেছে তাই দাদার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম—প্রণবকুমার সেনের ছেলে আশীষ, "দাদা"।

দাদা অতি স্নেহের সাথে আশীষকে কাছে ডেকে নিলেন। কিছু দিন আগে আশীষ ঘোড়া থেকে পড়ে যেয়ে খুব আঘাত পেয়ে ছিলো, "দাদা" সে কথা জানতেন। কোথায় আঘাত লেগেছিলো জেনে নিয়ে "দাদা" আত্মস্থ হয়ে সে জায়গায় হাত বুলিয়ে দিলেন, আর আশীষের

সর্বাঙ্গে দিলেন স্নেহের পরশ বুলিয়ে। আশীষ ও আমরা সবাই দাদাকে প্রণাম কোরলাম।

অনেক বার বলেছি দাদার আশীর্বাদ এ জগতের আশীর্বাদ নয়। এই আশীষের ধারা বয়ে যায় এই স্রোতিস্বিনী মন্দাকিনীর ধারার মতন। আত্মহারা, আত্মস্থ, অন্তর্মুখ দাদার এই আশীর্বাদ সুষমার ধারা বয়ে নিয়ে আসে। দাদার এই কল্যাণময় রূপ, উদাত্ত আশীর্বাদ রয়েছে প্রতিজনের জন্যে, লোক বিশেষে নয়। সেদিন দাদার কাছে বেশীক্ষণ বসতে পারি নাই। "দাদার" কছে থেকে অনুমতি নিয়ে ফিরে এলাম।

"দাদা" আদর করে মাঝে মাঝে বলেন "তুই তো অপূর্ব।" কিন্তু আমি জানি দাদাভাই একথা তোমার সবারই জন্যে, কারণ তুমি তো সবাইকে অপূর্ব হবার সুযোগ দিচ্ছ। তাই বার বার ঐ কথা বলো।

যে এই অপূর্ব হবার সুযোগ নিতে পারবে সেই জীবনে ধন্য। তোমার অপূর্ব কথার মর্যাদা যেন রাখতে পারি সেই আশীর্বাদই করো আমায়। "অপূর্বের" মাঝেই যেন আমার দিশেহারা পথ খুঁজে পায়।

তোমার আশীর্বাদই যেন আমার জীবনের একমাত্র পাথেয় হয়।

"দাদা! দাদাভাই আমার।"

[২৯ শে জুন রবিবার, ১৯৬৯ সাল। সন্ধ্যা ৭টা, ডাঃ সুধীর কুমার নন্দী (পি. এইচ. ডি) মহাশয়ের বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়ীতে দাদাকে ত্রয়োদশতম দর্শন]

দাদার কাছে অনেকদিন যেতে পারি নাই, বালগোপালদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্যে। আবার মনে মনে ভাবি, যখন তিনি যে ভাবে রাখবেন।

দাদার সুবাসিত অন্ধগন্ধ বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে অনুভব করি—বিশেষ করে "দাদা" যখনই মনে করেন তখনই সুমিষ্ট অপূর্বগন্ধ বাড়ীতে বসেই পাই। তাঁর কাছে দূরও নেই, নিকটও নেই। মাঝে মাঝে "দাদার" সাথে ফোনে কথা বলি—দাদাও মাঝে মাঝে ফোনে মনে করেন। এইভাবে দিন কেটে যাচ্ছে।

দাদা ফোন করে ডা: নন্দীর বাড়ীর পূজাতে আসবার জন্যে আদেশ করলেন। আদেশ তো নয়, বিনীত প্রার্থনা।

দাদার ওখানেই ডাঃ নন্দীর ও মিসেস নন্দীর সাথে পরিচয় হয়ে ছিলো। অত জ্ঞানীগুণী হয়েও দাদার কাছে সর্বদাই আসেন ও পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে দাদাকে দেখেন। অসীম স্নেহ দাদার তাদের উপরে।

আমার স্বামী ও আমি—ডাঃ নন্দীর বাড়ীতে যেয়ে সন্ধ্যা ৭টায় পৌঁছালাম। বাড়ী খুঁজতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিলো—ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম "দাদা" পূজার ঘরে ঢুকছেন, কিন্তু তখনও দরজা বন্ধ করেন নি, জোড় হাতে প্রণাম করছেন, সেই বিভূতিময় ভগবানের উদ্দেশ্যে। "দাদার" সেই প্রণামরত মূর্তি দূর থেকে মনে হচ্ছিল, একটা অপূর্ব দিব্যজ্যোতি ছড়িয়ে আছে, "দাদার" এই নশ্বর দেহের চারিদিকে।

ধন্য তুমি দাদা! যার কৃপা তুমি পেয়েছ,—তিনি তোমারই অন্তরে বিরাজমান, এই বিরাট বিশ্ব জুড়ে রয়েছেন তিনি। অবনত চিত্তে তাঁকেই জানাই প্রণাম।

পূজার পরিবেশের কথা আর কি লিখবো! সেই পরিবেশ সত্যিই ভাষায় মূর্ত কোরবার মতন ক্ষমতা আমার নেই। সেই মনোজ্ঞ সুষমামণ্ডিত পরিবেশ। পূজা অন্তে অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে সেই পূজারীর দিকে, যিনি ঢেকেছেন নিজেরে নিজের ছায়ায়।

সেদিন দাদার সাথে বিশেষ কথা হোল না। বহু লোকের সমাগম

হয়েছিল, নূতন লোক অনেক এসেছিলেন "দাদার" সাথে পরিচিত হতে। মিসেস মাসুদকে দেখলাম, তার কথা "দাদার" কাছে আগেই শুনেছিলাম।

"দাদা" আমাদের দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন "কখন এসেছিস তোরা, আয় আমার কাছে আয়।"

কিন্তু বেশ ভীড় ছিল বলে দাদার কাছে এগিয়ে যেতে পারলাম না। ভীড় একটু হালকা হয়ে গেলে আমরা "দাদার" কাছে যেয়ে তাঁকে প্রণাম কোরলাম ও আশীর্বাদ পেলাম। প্রণাম শেষে বেরিয়ে এলাম বাড়ী ফিরবার জন্যে।

বাইরে বেরিয়ে এসে মনে হোল, চাঁপা ফুলের গন্ধে দেহ আমার ভরপূর, কিন্তু কোথা থেকে আসছে এ সুবাস ? সামনে পিছনে চেয়ে দেখি কোথায় ও তো চাঁপা ফুল দেখতে পাচ্ছি না! হঠাৎ ডান হাতের ঘ্রাণ নিয়ে দেখি, এই তো এখান থেকেই আসছে সেই সুবাসিত চাঁপা ফুলের গন্ধ। এযে দাদার পাদস্পর্শের বিভূতি।

বিভূতি দা ও বিভূতিদার স্ত্রী রেণুদি, তখন বাড়ী ফেরার জন্যে বাইরে এসেছিলেন। আমি তাঁদের বোল্লাম—"দাদার" পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরেছিলাম দেখুন চাঁপা ফুলের গন্ধ।

ওরা ঘ্রাণ নিয়ে দেখলেন সত্যিই তো তাই। রেণুদি নিজের হাতে ঘ্রাণ নিয়ে বোল্লেন "কই আমার হাতে তো গন্ধ নেই। দাদা আপনাকে কত গন্ধই দিচ্ছেন।"

"দাদা সত্যিই যদি কিছু দিয়ে থাকো, তবে প্রাণভরে যেন উপলব্ধি করতে পারি। বহু সুগন্ধ, আমি বাড়ীতে বসেই পেয়েছি। আমার স্বামী বলেছেন। ফোনে তোমার সাথে কথা বোলবার সময়, এমন কি অফিস থেকে নেমে গাড়ীতে উঠবার আগে ফুটপাতের রাস্তায়, ও গাড়ীতে তোমার বিভূতিযুক্ত সুগন্ধের সুবাসের মন মাতানো প্রাণ ভরানো আশীর্বাদ অনুভব করেছেন প্রতি শ্বাসে, শ্বাসে।

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

এখন কি মনে হয় জান দাদা—যখনই তুমি আমাদের কথা মনে কর তখনই তোমার অঙ্গ গন্ধের সুবাস আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে জানিয়ে দাও, আমি আছি, আমি—থাকবো, যুগে যুগে থাকবো তোদেরই মাঝে।

আমার এ ধারণা ভুল কি সত্য, একমাত্র তুমিই জান "দাদা"—তোমার উত্তরের আশায় প্রতীক্ষা করে রইলাম।

আমার গভীর শ্রদ্ধা রইলো

[১১ই জুলাই শুক্রবার, ১৯৬৯ সাল—সকাল ৮টা, আমার 'মাটির মায়া' কুটিরে দাদার আগমন। চতুর্দশতম দর্শন।]

গৌতমরা ১৫ তারিখে পুণা ফিরে যাবে ছুটি শেষে। আমি আর গৌতম যেয়ে দাদাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এলাম।

"দাদা বলেছিলেন ওদের আমার সাথে দেখা না করিয়ে ফেরৎ পাঠাস্ না। যাবার আগে নিশ্চয়ই দেখা করিয়ে নিয়ে যাবি।"

"দাদার" ইচ্ছানুসারেই তিনি এলেন। "দাদার" আসবার খবর পেয়ে, মিসেস আরতি সেন ও রত্না রায় চৌধুরী, মেজর দাস আমাদের এখানে এসেছিলেন "দাদাকে" দর্শন করতে।

গাড়ীতে "দাদাকে" নিয়ে যখন আসছিলাম, হঠাৎ দেখি "দাদা" গাড়ীর বাইরে হাত বাড়াতে তাঁর হাতে এসে পড়লো, শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ রূপে রামঠাকুরের পট।

আমার হাতে দিয়ে বল্লেন "নে তোর বৌদি, আরতিকে দিস্।"

আমি তো বিস্ময়ে অবাক,—চলন্ত গাড়ীর মধ্যেও ইচ্ছাময়ের হাতে ইচ্ছা মতন জিনিষ চলে আস্‌ছে।

এর আগে যে পটখানি বৌদিকে দিয়েছিলেন, ওর দিদি রত্নাকে সেই পটটি দেওয়াতে, আমিই "দাদাকে" অনুরোধ জানিয়েছিলাম আর একখানি ঠাকুরের পট বৌদিকে দেবার জন্যে।

বাড়ীতে এসে পৌঁছাতেই চেয়ারের নীচের থেকে "দাদা" বার করে দিলেন "শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালি"। বৌদির হাতে দিয়ে বল্লেন, "রোজ একবার করে পড়বে।"

কোথা থেকে চেয়ারের নীচে পাঁচালী এলো ভগবানই জানেন। —শুধু আমরা দাদার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সেদিন আমার এখানে আমার বন্ধু বিভা গুহ সরকারও ছিলো। সে জিজ্ঞাসা কোরছিলো দাদাকে পূজা না করলে মন্দিরে না গেলে মনের শান্তি হয় না, তাছাড়া অভ্যাস না করলে, তাঁকে কি করে পাবো —অভ্যাসের জন্যেই তো জপতপের দরকার।

"দাদা" বল্লেন সবই তোমার মনের কাছে। সব তো তোমরা সাথে নিয়েই এসেছ— তবে এত চিন্তা কোরছ কেন যার করাবার তিনিই ঠিক তোমাদের দিয়ে করিয়ে নেবেন। তোমাদের দেহই তো মন্দির, সেই মন্দিরেই তিনি আছেন— কোথায় মন্দিরে মন্দিরে তাকে খুঁজে বেড়াবে।

"দাদার" অমৃতময় বাণী সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। মনের যা সমস্যার প্রশ্ন আছে সবাই তুলে ধরলো "দাদার" সামনে।

একটু পরেই "দাদা" জাষ্টিস পি. বি. মুখার্জীকে ফোন করলেন, সে ফোনের যোগাযোগ আমিই করে দিয়েছিলাম।

মিসেস মুখার্জী গীতাদিকে আমি কলেজ জীবন থেকেই জানি। তিনি নানারকম জনহিতকর কাজের জন্যে সর্বজন পরিচিত।

জাষ্টিস মুখার্জী শুধু জাষ্টিস হিসাবে নয়, তাঁর দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের কথা সর্বজন সুবিদিত। শুধু জ্ঞানই নয়, ভক্তির তাঁর তুলনা নেই। আধ্যাত্মিক জগতে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই খুব উন্নত। আমাদের দেশে একেই বোধ হয় রাজযোটক বলে।

দাদা চীফ জাষ্টিস পরেশ মুখার্জী, মিসেস দীপনারায়ণ সিন্‌হা আরও ২।৪ জনকে এদিক ওদিকে ফোন করে আবার স্বস্থানে এসে বসলেন। অনেকক্ষণ সমাহিত আত্মস্থ অবস্থায় অবস্থান কোরবার পর

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

দাদা গৌতম, অরুণা ও নাতিদের আশীর্বাদ করে তাদের ভাল মন্দর বোঝা নিজের উপরে টেনে নিলেন। দিয়ে গেলেন চরণজল ওদের সাথে রাখবার জন্যে।

আমার স্বামীকে ডেকে বল্‌লেন—'রবিবার গৌতমকে নিয়ে আমার ওখানে যাস্, যাবার প্রয়োজন আছে।"

দাদা বিদায় নিলেন—প্রতিবারই আমি গোপনে কামনা করি আবার তুমি এসো "দাদা"।

আমার দাদা এলে বাড়ীর ব্যস্ততা ও কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় আপনা থেকেই। আমার বাড়ীর লোকজনেরাও দাদার দিকে ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দাদার সেই অপরূপ রূপের দিকে।

যে মধুময় পরিবেশের মধ্যে আমরা থাকি তখন মনে হয় সবই মধু—তুমি মধু, আমি মধু, সকলই মধু, মধুময়।

আঃ এ যে কি আনন্দ—তার প্রকাশ কি করে করি বলতো দাদা আমার।

শুধু চাই তোমার আশীর্বাদ।

[১৩ই জুলাই, রবিবার, ১৯৬৯ সাল! সকাল ৭টা দাদার ভবনে পঞ্চদশতম দর্শন।]

১৩ই জুলাই ভোরে দাদার আদেশে, গৌতম, মিঃ গুহ ও আমি "দাদার" ওখানে গেলাম।

"দাদা ভাই" তোমাকে দেখবার সাথে সাথেই মন যে কি তৃপ্তিতে ভরে ওঠে, তোমাকে বোঝাই কেমন করে বলতো! দূরে থাকলে তোমাকে দেখি অন্যরূপে, কাছে এলে মনে হয় সেই আমার স্নেহময় "দাদা", "দাদাভাই" "গোপাল ভাই"।

ঘরে ঢুকে বোসলাম দাদাকে প্রণাম করে। সেদিন দাদা বিশেষ করে গৌতমকে আসতে বলেছিলেন।

একটু পরে "দাদা" হাত উঁচু করে কি একটা জিনিষ মুঠো করে গৌতমের হাতে নিয়ে বল্লেন—

"নে ধর, সব সময় সাথে রাখ্‌বি।"

দাদার হাতে তো কিছুই ছিলনা, হঠাৎ কি জিনিষ "দাদার" হাতে এলো বুঝতে পারলাম না। "দাদার" হাতের তালুটি লাল গোলাপী বর্ণ। আমার স্বামী সব সময় বলেন "দেখেছ দাদার হাতের তালুর রঙ—যেন গাঢ় গোলাপী আভা দিচ্ছে।" দাদা গৌতমকে আবার বললেন

"এই জিনিষটি কাউকে দেখাবি না—বুঝলি।"

আমরা "দাদার" কথা মেনে নিয়ে জিনিষটি কি জানবার কৌতূহলও মনের কোণে স্থান দিলাম না।

বিভূতি দা তখন সামনে বসে ছিলেন। জ্ঞানী, গুণী, শাস্ত্রজ্ঞ লোক তিনি। ডকটরেট্, কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই, এমন কি ডক্‌টরেট উপাধিও ব্যবহার করতে চান না।

বিভূতি দা যেন ছোট্ট শিশুটির মতনই "দাদার" আশে পাশে সর্বদাই আছেন। "দাদাও" দেখেছি বিভূতি বলতে অস্থির। বিভূতি-দা নিজেকে বলেন অজ্ঞ ও মুর্খ। বলেন "দাদা" আমাকে গরু বলে ডাকেন।

আমি উত্তরে বোলেছিলাম, গরু হওয়া তো ভাগ্যের কথা—কত উপকারী জন্তু—একাধারে আমাদের মা—আর হিন্দুদের দেবতা।—আমরা তো শেয়াল বেড়ালের দলে, কোন কাজেই লাগি না।

শুনে বিভূতি দা একটু হাসলেন, সেই শান্ত হাসি।

বিভূতি দাকে সবাই চেনেন ও জানেন। আমি আর ওর কথা বিশেষ কি লিখবো। লিখবার ক্ষমতাও আমার নেই!

বিভূতি দা বল্লেন—"দাদা ওরকম একটা জিনিষ তাঁর ছেলেকেও

দিয়েছিলেন আসাম যাবার আগে। সঙ্গে যাচ্ছিল তার এক বন্ধু—তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজের ওপরে বন্যার জন্যে প্রায় বুক জল ঠেলে তাদের সেই ব্রীজ পার হতে হয়েছিলো কারণ ট্রেন যাওয়ার সাধ্য নেই। সে সময় তারা নানা বিপদের মধ্যে পড়ে ছেলের বন্ধুটির হাঁটুর জয়েণ্ট ডিসলোকেশন হয়ে যায়—বিভূতিদার ছেলে প্রবীর তখন দাদার দেওয়া জিনিষটার কথা মনে পড়াতে সেটি নিয়ে সে বন্ধুর পকেটে দেয়। একটু পরেই পা-টা সরাতে যেয়ে আবার ঠিক জায়গায় এসে সেট করে যায় অদ্ভুত ভাবে, আর ছেলেটির আবার হাঁটাচলা করা সম্ভব হয়।

এতেই কি মনে হয় না, আমরা ইচ্ছাময়ের বিরুদ্ধে এক পাও চলতে পারি না। অসীম একটা শক্তি আমাদের টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলে পঙ্গুকেও গিরি লঙ্ঘন করিয়ে দিতে পারেন।

"হে ইচ্ছাময়" তুমি কত অন্তরঙ্গরূপে এসে দাঁড়িয়েছ আমাদের মধ্যে। তোমাকে চিনবার ও জানবার শক্তি দাও আমাদের—তোমার ইচ্ছা না হলে কিছুই হবে না ঠাকুর।

"শক্তিময় দাদার" সংস্পর্শ, যুবকদের মনে এনে দেয় বিচিত্র অনুভূতি, শক্তি ও সাহস।

১৫ই জুলাই ভোরে আমার বড়ছেলে গৌতম পুণা ফিরে গেলো—মনে নিয়ে গেলো অদ্ভুত সাহস ও অসীম নির্ভরতা।

গৌতমের চিঠির ২।১টা লাইন থেকেই স্পষ্ট ও আরও পরিষ্কার ভাবে জানা যাবে—"দাদা" কি গভীর ভাবে ওর মনকে নাড়া দিয়েছেন, ও অন্তরে তাঁকে পাবার উপলব্ধি জাগিয়েছেন।

গৌতম লিখেছে—সব সময়ই "দাদার" কথা মনে হয়। ওঁনার ঠিকানা জানলে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতাম। "দাদার" কথা ভারী সুন্দর। মাঝে মাঝে মনে ভেবে শান্তি পাই।"

আবার লিখেছে "আমাদের এখানে এমন একটা অন্যায় হচ্ছে, বোলবার কথা নয়। তারই বিরুদ্ধে আমি ছোট অফিসার হয়েও

প্রতিবাদ কোরছি। তার ফল ভাল কি মন্দ জানি না। তখনই মনে হয়েছে "দাদার" কথা, যে উনিই বোধ হয় অজ্ঞাতে আমাকে সৎসাহসটা দিয়েছেন।"

আর এক জায়গায় লিখেছে "যে দেশের মানুষ, মানুষকে হেয় করে সে দেশকে ভগবান কখনই ভালবাসতে পারেন না।" "দাদা" এই কথাটাই বোঝাতে চান সবাইকে। ওঁনার কাছে বস্তির লোকও যা— হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিসও তাই। যদি সত্যিই ভগবানের উপর Tremendous faith (অসীম বিশ্বাস) থাকে, তা হলে যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ানো যায়। যোগী না হলে অসাধ্য সাধন করতে পারে না। "দাদার" কথা মনে পড়ে, মনের ভয়টা একেবারেই নেই বল্লেই চলে! মনে হয় সব সময়ই উঁনি সাহস যোগাচ্ছেন।

"দাদা ভাই", তোমার সংস্পর্শে এসে প্রতিটি যুবক যদি এইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তবে আমাদের দেশ সোনার দেশ, সত্যরাজ্যের দেশ হতে দেরী হবে না। কারণ এরাই যে আমাদের দেশের ভবিষ্যত।

আমার আর একটি ছেলে জয়ন্ত ক্যানাডাতে থাকে। সে এখান থেকে ডক্টরেট করে ওখানে শিক্ষা লাইনে আছে রিসার্চের জন্যে— তাকেও গৌতম "দাদার" কথা লিখেছে। জয়ন্তও গৌতমের কাছ থেকে দাদার কথা জেনে "অভিভূত" ওর চিঠির ভাষায় বুঝলাম। জয়ন্ত লিখেছে "তোমরা যে একজন গৃহী মহাযোগীর দেখা পেয়েছ, শুনে খুব খুশী হয়েছি। এরকম মহাপুরুষ যে থাকতে পারেন সেটা আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আছে। "ইচ্ছাশক্তিই" হোল সবচেয়ে বড় শক্তি। এখানে যোগ নিয়ে প্রায়ই আমার আলোচনা করতে হয়, কারণ এদেশের লোকেরা খুবই উৎসুক জানবার জন্যে—সত্যিকার যোগী মহাপুরুষদের কাছে এই জন্যই আমরা চিরকৃতজ্ঞ। "দাদাকে" আমার প্রণাম জানিও।

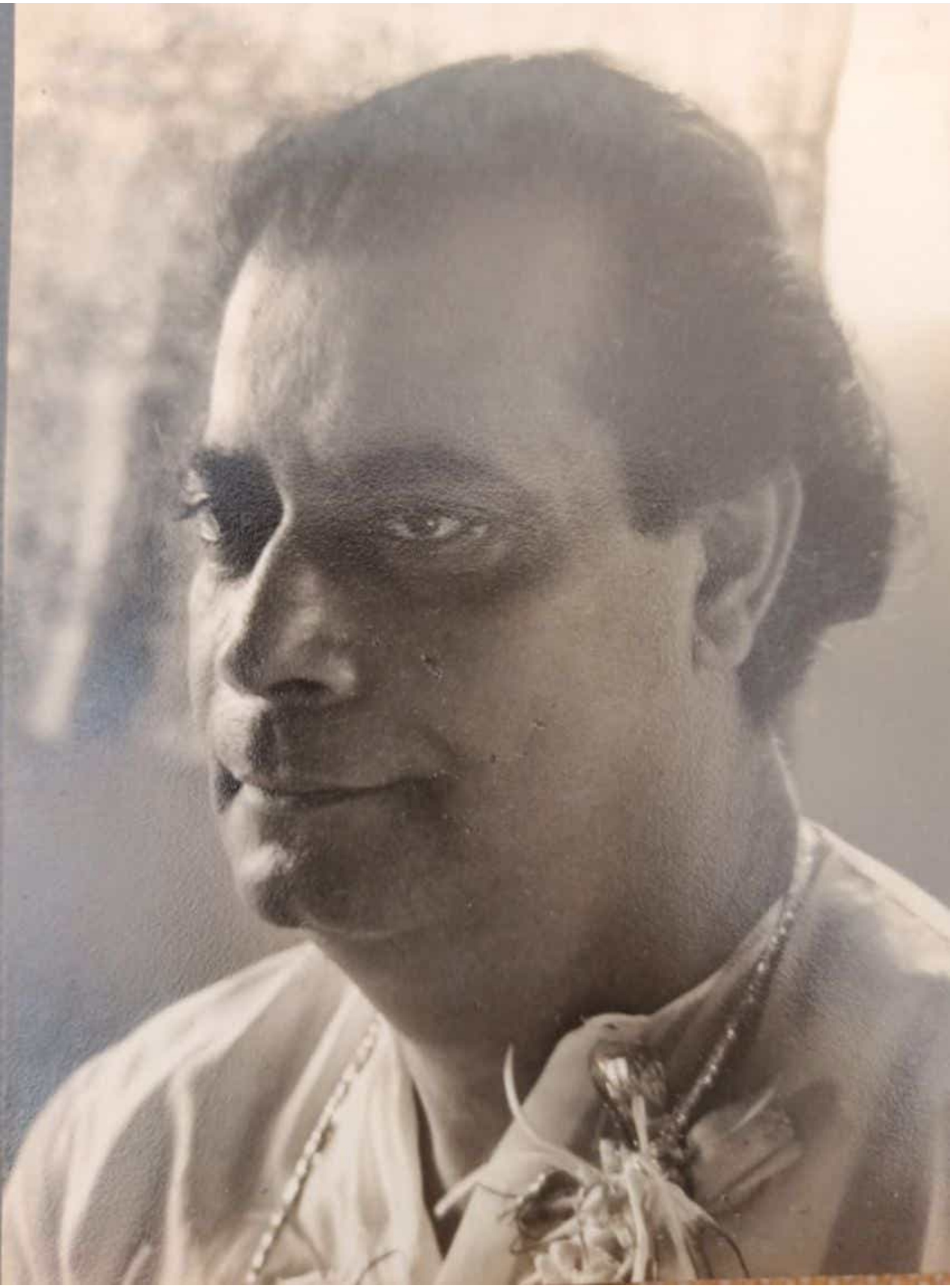

বাবা! তোমার দেওয়া, ভাগবত গীতা, হিন্দু ভিউ অফ্ লাইফ (Hindu View of Life) ও "দি সংগ অফ্ গড (The Song of God) এদেশের লোকদের সাথে হিন্দু ধর্মের আলাপ আলোচনার জন্যে খুব কাজে লাগে। হিন্দু ধর্ম যে অতি উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক ব্যাপার ও জীবন দর্শন এই বইগুলির থেকে ভালভাবেই বুঝিয়ে দেওয়া যায়।"

"দাদা ভাই" দূর দূরান্তে তোমার আলোর জ্যোতির প্রভাবে প্রভাবিত হউক সকল হৃদয়। তোমার মাঝেই যেন খুঁজে পায় আলোর উজ্জ্বল জ্যোতি, উপলব্ধির অন্তরে অন্তরে।

"হে জ্যোতিঃস্বরূপ" তুমি প্রকাশিত হও দিকে দিকে— প্রকাশিত কর সবার অন্তর তোমার জ্যোতির পরশে।

তোমার পায়ে আমার অন্তরের নিবেদন রাখলাম।

———

১৫ই জুলাই, মঙ্গলবার ১৯৬৯ সাল। সকাল ৯-৩০ মিনিট ডাঃ অনিল মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে "দাদার" প্রকৃতির সাথে লীলা খেলা— ষষ্ঠদশতমদর্শন।

১৫ই জুলাই সকাল ৯-৩০ মিনিটে ডাঃ মৈত্রের বাড়ীতে যেয়ে দেখি 'দাদা' সেখানে রয়েছেন। গৌতমরা চলে যাওয়াতে মনটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো। 'দাদাকে' ওখানে পেয়ে মনটা ভরে গেলো।

বসে আছি 'দাদা ভাই'-এর সামনে—মনের মাঝে কত ভাবই রঙ্গীন হয়ে উঠছে, কত কথাই খেলে যাচ্ছে—আবার 'দাদার' সাথে কত ভাবের আদান প্রদান হচ্ছে, কত দুষ্টামি, কত মান অভিমান চলছে,— অতি আপন জনের সাথে আপন জনের খেলা,—চিরসুন্দরের সাথে চিরন্তনের মেলা,—তারই সাথে বিলীন হয়ে যাচ্ছে কত অভিব্যক্তি।

'দাদা' অন্তরের গভীর দৃষ্টি দিয়ে জেনে নিচ্ছেন সবাকার মন কাছের ও দূরের।

বসে রয়েছি দাদার সামনে, মিসেস মিনু দে, মিসেস বি. পি. ঘোষ, মিসেস রেণু মৈত্র, মাধুরী মৈত্র ও আমি। আনন্দময়ের সাথে আনন্দের পরিবেশে এই পরিবেশ ছেড়ে কারো মন উঠতে চাইছেনা।

'দাদা' মাঝে মাঝে ফোন করছেন ও আমাদের সাথে কথা বল্‌ছেন।

ইতিমধ্যে 'দাদা' বেণারসের শোভামাকে ফোন করে কথা বলছিলেন, "তোরা তো মা টা হইছস, কত কাজ তোগো। আমি তো কিছুই হতে পারলাম না—এই বাবা টাবা আর কি। আমাকে বিয়ে করবি নাকি?" এই সব কথা আর কি।

আবার সুচিত্রা সেনের ফোন পেয়ে বোল্লেন "আরে আমি তো আছিই এটাই তো রয়েছে সাথে সাথে—হ্যাঁ গাড়ী পাঠিয়ে দিস্ যাবো।" কিরে বরণ ডালাটালা সব তৈরী তো! এক শর্তে তোকে বিয়ে করবো —তোর যেখানে যা আছে সব দিবি তো আমায়। কিই বা তুই আমাকে দিতে পারবি? আচ্ছা! আচ্ছা! গাড়ী পাঠিয়ে দিস্ যাবো।

আমি বোল্লাম 'বলে দিন দাদা আমরা সবাই বরযাত্রী যাবো। একবেলা তো আপনার বিয়ের কৃপায় খাবার ভাবনা কমবে। আর রোজ রোজ নেমন্তন্ন খেলে, সকালে ক্ষিদে নাও লাগতে পারে।' এই সব দুষ্টামী চলছে 'দাদার' সাথে আপন জনের সাথে।

['দাদা' বললেন—'দেখ বিয়ে তো সবার সঙ্গে সবার হয়েই আছে। বিয়ে অর্থ যুক্ত 'ব্রজভাষা' বিয়ে এক মহাযোগ—যুক্ত অবস্থায় মন যখন স্পর্শ, স্পন্দন, কম্পনের অনুভূতির অতীত—স্থির ধীর ও নির্বিকল্প সেই হোল মহাযোগ, সেই হোল বিয়ে—। স্ত্রী কে? পুরুষ কে? নরই বা কে? নারীই বা কে? সবই একই জন। দাদা এই সময় মহাভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন।]

সময় কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে জানিনা, হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়লো দেখলাম সময় হয়েছে ১০-২০ মিনিট।

হঠাৎ সারা আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো, ঢেকে গেলো সূর্য্যদেবের মুখ। সাথে সাথে আরম্ভ হোল বাতাস ও জোর বৃষ্টি।

ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল দরজা দিয়ে এসে 'দাদার' গায়ে লাগ্‌ছিলো, মিনু দরজা বন্ধ করে দিতে চাইলে দাদা মানা কোরলেন।

'দাদা' বৃষ্টির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। সেই বৃষ্টির রূপও অপরূপ। বাতাস ও বৃষ্টির খেলা। কখনও বাতাস বলছে আমার জোর বেশী, বৃষ্টির ধারাগুলিকে নিয়ে এদিকে এদিকে ইচ্ছা মতন খেলা করে যাচ্ছে। আবার বৃষ্টি দেখাচ্ছে—দেখ আমারও জোর বেশী—বড় বড় ধারায় নেমে বাতাসকে জব্দ করছে। আবার মাঝে মাঝে দু'জনের খুব ভাব—বলছে আমরা দুই-ই এক।

বাতাস বরিষে হয়েছে মিতালী, দু'জনে দু'জনে করে কোলাকুলি —

বৃষ্টির এই অপরূপ রূপের সাথে 'দাদার' অপরূপ রূপ মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছিলো। অন্তরের গভীর দৃষ্টিতে দাদা প্রকৃতির খেলা দেখ্‌ছিলেন। রূপঘনসন্নিবিষ্ট 'দাদার' সেই রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্যের অতীত—মনে হচ্ছিল নিজের মধ্যে তিনি ছিলেন না—অপূর্ব উজ্জ্বলময় দেখাচ্ছিলো দাদাকে—যেন দিব্য জ্যোতিতে সারা ঘর আলোকিত। আমার মনে হচ্ছিল অদ্ভুত আলোর জ্যোতি আমাদের সবাইকে ঘিরে রেখেছে। কয়েক সেকেণ্ড দিশেহারা ও অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

হৃদয়ের গভীর আবেগে অন্তঃস্থল তোলপাড় কোরছিলো—হয়তো একটি মূহূর্তের ব্যাপার।

হঠাৎ দেখি দাদা বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তিনবার হস্ত সঞ্চালন করে থেমে যাবার ইঙ্গিত করছেন। সেই হস্ত

মুদ্রার বর্ণনার ভাষা আমার নেই। মনে হোল অসীম শক্তিময়ের ইচ্ছার অঙ্গুলী হেলনে রয়েছে তার আদেশ পালনের ইঙ্গিত।

হোলও তাই—মুহূর্তের মধ্যে অত প্রচণ্ড বৃষ্টি ধারা নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। আর যেন তার আদেশ অগ্রাহ্য কোরবার শক্তি নেই।

বৃষ্টি থেমে গেলেও কালো মেঘ ঢেকেছিলো সূর্য্যদেবের মুখ! দাদা তখনও তন্ময় হয়ে বসেছিলেন, বাহ্যদৃষ্টি রহিত।

আবার দেখি দাদা মেঘে ঢাকা সূর্য্যদেবেকে ঐ রকম ভাবে হস্ত সঞ্চালন করে সঙ্কেত করছেন। নিজের চোখে দেখলাম কালো মেঘরাশিকে দু'ধারে সরিয়ে নিয়ে সূর্য্যদেব বেরিয়ে এসে রৌদ্রের আলোতে ভরে দিলেন আশে পাশে। মনে হোল সূর্য্যও যেন মুখ উদ্ভাসিত করে বল্লেন—'দাদা, শুধু বৃষ্টি থেমে যেয়েই তোমার আদেশ পালন কোরল না, আমিও তোমার আদেশ মাথা পেতে মেনে নিলাম।'

"দাদার মুখেও সেই একই হাসি। সেই হাসিতেই প্রকাশ পাচ্ছে সর্বময় তিনি—সর্ব যুগে যুগে তিনি—চিরসত্য, চিরনূতন, চিরন্তন অনন্তময়। মনে মনে শতবার তাঁকে প্রণাম জানালাম,—প্রণাম জানালাম অন্তরদেবতাকেও।

"দাদা" একটু পরে সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন ও স্নেহময় হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের 'কিরে বুঝলি কিছু'।

আমি তখন 'দাদার' দিকে চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি। দেখছি সেই সহজ, সরল—অতি আদরের আমাদের 'দাদা'।

মনে মনে ভাবলাম যাঁর অঙ্গুলি হেলনও প্রকৃতি আনন্দের সাথে মেনে নেয়,—তাঁকে ব্যক্ত কোরবার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। অব্যক্ত তিনি। তাঁর কৃপা হলে পাওয়া যায় অন্তরের উপলব্ধি। তিনি যে সর্বময়,—সর্বগুণের আঁধার।

'দাদা' আমাকে বল্লেন—'তোকে' দেখালাম। এর সম্বন্ধে তুই তোর নিজের উপলব্ধির কিছু লিখবি। বুঝলি ?

"দাদাকে" বোল্লাম অন্তরের উপলব্ধি ছাড়া, এ বোঝাবার শক্তি বা ভাষা নেই দাদা। তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তোমার যদি আশীর্বাদ থাকে, ও তিনি উপলব্ধি দিলেই লিখতে পারবো। না হলে সব চেষ্টাই বৃথা।

'দাদা' বল্লেন 'তাঁর আশীর্বাদ তোর সাথে সাথেই আছে। তুই লিখিস্, কেমন ?'

আমি দাদার আদেশ শিরোধার্য্য করে নিলাম।

"দাদা" আবার শোভামাকে ফোন করে বল্লেন "কি কাণ্ড হোল দেখলে তো ? কোথায় যাচ্ছিলে যাও, আর বৃষ্টি হবে না তোমার না পেঁছানো পর্যন্ত। শুনলাম শোভামা তাঁর আশ্রম কল্যাণীতে যাবেন।

শোভামা উত্তরে যা বল্লেন ফোনের রিসিভারটা অনিমাদির কানে দিয়ে শোনালেন 'এ তোমারি কাণ্ড পাগলা বাবা।'

মিসেস বি. পি. ঘোষ, আমাদের অনিমা-দি বোলছিলেন—নিশ্চয়ই কোন ভক্ত আসছে দাদার কাছে। সত্যিই বৃষ্টি থামবার ২।৪ মিনিট পরেই কণা সেনগুপ্তা এসে ঘরে ঢুকলেন। কণা বল্লে "নীচে আমার ট্যাক্সি থামার সাথে সাথেই অত প্রচণ্ড বৃষ্টি থেমে গেলো।"

এযে কত বড় ঐশ্বরিক শক্তি, সে বিচার কোরবার শক্তি আমার নেই।

একটু পরে "দাদা" কাজ আছে বলে উঠবার অনুমতি চাইলেন আমাদের কাছে। ভক্ত বৎসল তিনি, তাই তাঁর অনুমতি চাওয়া। "দাদা উঠে যাবেন বলে সবারই মন ভার হোল' বুঝতে পেরে আমাদের বল্লেন—

"তোরা যদি আমায় ছেড়ে দিতে না চাস বোন, তবে আমি কাজ কি করে করবো বল ? আমার পেটেরও তো দুটো যোগাড় করতে

হবে, খেতে হবে—খেতে দিতে হবে তো। না তোরা চাস্ যে আমি গুরু-গিরির ভিক্ষা করে খাই?—বল তোরা? তোরা যদি বলিস খেটে খাওয়ার থেকে ঐটেই বেশী সম্মানের হবে তবে আমি বসি।" দাদা হেসে হেসে কথাগুলি কইলেন। আমরা চুপ করে রইলাম—মনে হোল দুনিয়ার অন্ন যিনি দিচ্ছেন তাঁর আবার অন্নচিন্তা। এযে মহাদেবের অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা চাইবার মতন অবস্থা। লীলাময় হয়ে কত খেলাই খেলছেন তিনি আবার অতি সহজ সরল, অতি আপন আমাদের দাদা, দাদাভাই।

"দাদা যাবার আগে আমাকে ও কণাকে বাদ দিয়ে অন্যান্য সবাইকে সন্ধ্যাবেলা আবার ডাঃ মৈত্রের বাসায় আসতে বল্লেন, লেখার ব্যাপারে ডাঃ নন্দী আসবেন বলে।

নীচে সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে আমাকে আদেশ করলেন জোরের সাথে "তুই সন্ধ্যাবেলা নিশ্চয়ই আসবি, বুঝলি।"

আমি বুঝতে পারিনি তাই দাদাকে জিজ্ঞাসা কোরলাম—আজই কি লিখে আনতে হবে?

দাদা বল্লেন "লেখা হোক না হোক তুই আসবি।"

আমাকে আদেশ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। আমরা ওঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দাদার হাঁটুতে তখন ব্যথা ছিলো। শুনেছি এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাঁটু ফুলে ব্যথায় অনেকদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন, দাদা নাকি তার ভোগ নিজের উপরে নিয়েছেন। নিজের হাঁটুতে ফোলা ও ব্যথা করে বসে আছেন।

সবারই দুঃখকষ্টে দাদার প্রাণ কাঁদে—হে ক্লেশ-দুঃখহর হরি, তোমার খেলা বুঝবার শক্তি আমাদের কোথায়। তোমার অলৌকিক

খেলায় যেন মুগ্ধ না হই। অন্তরে গভীর উপলব্ধির মধ্যে তোমাকে পেতে দাও প্রভু, সেই প্রার্থনাই তোমার কাছে করি।

১৫ই জুলাই দুপুর বেলা—

বেলা প্রায় ১২টার সময় বাড়ী ফিরে এলাম। দুপুরবেলা, অন্য কাজে মন বস্‌ছিলো না, মনে সকাল বেলার ঘটনা খেলা করে বেড়াচ্ছে —আর মনে পড়েছে "দাদার" আদেশের কথা। মনের তাগিদে ও অসহ্য অনুভূতির টানে "দাদার" আশীর্বাদ ভিক্ষা করে, খাতা কলম নিয়ে লিখতে বোসলাম, লিখেও ফেল্লাম ; জানি না প্রকাশ করতে পেরেছি কিনা আমার উপলব্ধির অল্প কিছুও। (লেখাটা আমার দাদার সাথে ষষ্ঠদশতম দর্শন অনিল মৈত্রের বাসায়—প্রকৃতির সাথে দাদার খেলা এই অধ্যায়ে আছে।)

লেখাটা আর পড়ে দেখলাম না, ভাবলাম সন্ধ্যাবেলাই সর্ব প্রথম দাদার কাছে যেয়ে পড়বো।

১৫ই জুলাই—সন্ধ্যাবেলা—সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত ৮টা বেজে গেলো, কিন্তু সাংসারিক অসুবিধার জন্যে দাদার কাছে যেতে পারছিনা— "দাদার আবার একি খেলা এই ভাবছি। প্রায় ৮—২০ মিনিটে আমার স্বামী অফিস থেকে ফেরা মাত্র ওঁর কাছে অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সব সময় মনে হচ্ছিল কেউ যেন "দাদার" কাছে যাবার জন্যে আমার মনের সূতো ধরে টান্‌ছে।

ডাঃ অনিল মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে ঢুকে দেখলাম, বহু জ্ঞানী গুণী লোকে "দাদার" ঘর ভর্তি। একজন গেরুয়া বসনধারী বৈষ্ণব ভক্ত নাম শ্রীযুক্ত পরিমল ঠাকুর—সোফাতে বসে "দাদার" সাথে কথা বলছেন। তিনি সেই দিনই নাকি দাদাকে প্রথম দেখলেন।

তিনি বোলছিলেন —"দাদাকে" দেখবেন বলে বিকাল থেকেই ঐ ঘরে এসে বসে আছেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা কোরবার পর "দাদা" আসছেন না দেখে চলে যাবেন বলে যেই উঠতে যাচ্ছেন, সেই সময়

হঠাৎ দেখতে পেলেন—পাশের দেয়ালের ভেতর থেকে "দাদা" এসে সামনে আবির্ভাব হোলেন। বাইরের থেকে ভেতরে ঢুকবার দরজা যেমন বন্ধ তেমন বন্ধই আছে। তিনি তো দাদাকে দেখে অভিভূত ও আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন।

শ্রীপরিমল ঠাকুরজী আরও বোল্‌ছিলেন যে তিনি নাকি রোজ ভোরে তিনটার সময় "দাদার" সাথে কীর্তন করেন ও কীর্তনান্দে নাচেন দু'জন মিলে—সেই সময় নাকি তিনি "দাদাকে" চিনতেন না।

"দাদা ভাই" আমি এ সুক্ষ্ম দেহতত্ত্ব কিছুই বুঝতে পারি না বা বুঝতে চাই না। আমি তোমাকে শুধু স্নেহময় "দাদা" বলেই জানতে চাই, বুঝতে চাই।

ডাঃ নন্দী ও ঘরের অন্যান্য সবাই বৈষ্ণব মহারাজের কথা শুনছিলেন। কথা শেষ হোতেই আমার হাতে খাতা দেখেই দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—

"কিরে লিখে এনেছিস, আয় আমার কাছে আয়, পড় দেখি।"

আমি অনিমাদিকে ডাকলাম আমার পাশে বসতে। চারিদিকে এত জ্ঞানী, গুণী লোক। আমি সামান্যা, জ্ঞান নেই, বুদ্ধি নেই,—তবুও দাদার আদেশে, মনে মনে সর্বশক্তিমানকে স্মরণ করে পড়তে আরম্ভ কোরলাম। জানি না, তার মধ্যে কিছু "দাদার" আশীর্বাদে প্রকাশ করতে পেরেছিলাম কিনা, তবে দাদা ফোন করে আমাকে পরে বোলেছেন "অপূর্ব হয়েছে! তুই তো ডকটরেটদের চোখেও জল এনে দিয়েছিস।" সেটুকুই আমার আনন্দ।

"দাদা" সেই সময় আবার আমাকে আদেশ কোরলেন "আমার সাথে তোর দেখা হবার পর প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত যা তোর উপলব্ধি হয়েছে, যা তুই জানতে পেরেছিস্‌ ও পেয়েছিস্‌, ও তোদের মনোভাব সব কিছুর ধারাবিবরণী বিস্তারিত ভাবে লিখবি।"

দাদার আদেশ মাথা পেতে নিলাম—কিন্তু মনে মনে "দাদার"

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

কাছে আব্দার জানালাম "এ কাজের ভার আমায় যেমন দিলে "দাদা", শক্তিও তোমাকেই দিতে হবে।"

এসব ব্যাপারের মিনিট পাঁচেক পরে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। "দাদাই" আমাকে সুস্থ করে তুল্‌লেন। "দাদা" পরে সবাইকে বলেছেন—

"রেণুর শরীর খারাপ হবে বলেই আজ সন্ধ্যায় ওকে এখানে ডেকেছিলাম। অন্যখানে হোলে জীবনের আশঙ্কা ছিল।"

একথা শুনে মনে হোল, "দাদা" কি করলেন। আমার কথা রাখলেন না। বেশ "দাদার" সামনে চলে যেতাম। তবে "দাদার" খেয়াল খুশীর পরে কারো হাত নেই। পরে দাদাকে জিজ্ঞাসা করতে বোলেছেন "তোর কাজ বাকী আছে এখনও শেষ হয় নাই।"—কি কাজ দাদাই জানেন।

সেদিন ঠিক শরীর খারাপ হবার আগে দেখছিলাম "দাদা", ডাঃ নন্দী, মিসেস নন্দী, পোর্ট কমিশনারের মিঃ ব্যানার্জি ও মিসেস ব্যানার্জিকে "দাদার" দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে ঘ্রাণ নিয়ে দেখতে বোলছিলেন। "দাদার" দেহের বিভিন্ন অংশ, বিভিন্ন রকমের সুগন্ধ সুবাসে সুবাসিত। তাঁরা সবাই ঘ্রাণ নিয়ে অনুভব কোরছিলেন।

একই অঙ্গে এত রূপ, একই অঙ্গে এত বিভিন্ন রকমের সুবাসিত সুগন্ধ—ইনি কে? এই প্রশ্নই মনে জাগছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে এলে কি ধরায়?

[১৭ই জুলাই, বৃহস্পতিবার, ১৯৬৯ সাল ডাঃ অনিল মৈত্রের বাড়ীতে — সপ্তদশ দর্শন।]

১৭ই জুলাই সকাল ৯টার সময় ডাঃ মৈত্রের বাড়ীতে, লেঃ কম্যাণ্ডার রথীন দাসকে নিয়ে "দাদার" সন্দর্শনের আশায় এলাম।

রথীনের খুব ইচ্ছা দাদাকে দেখবার ও দাদার কথা শুনবার। রথীন বেঙ্গল পাইলট সার্ভিসে আছে ও এক্সপ্লোরার ক্লাবের সেক্রেটারী। ডিউক ও পিনাকীকে সাগর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে রথীনই গিয়েছিলো সাথে। তাছাড়া ওদের খুঁজতে ও গিয়েছে দু'বার। নিজেও এবার বালি দ্বীপে বোটে করে পাড়ি দেবে বলে কথা।

"দাদার" সাথে দেখা করাবার আমি উপলক্ষ্যমাত্র। যা কোরবার "দাদাই" করিয়ে নিচ্ছেন।

ডাঃ মৈত্রের বাড়ীর নীচে "দাদার" গাড়ী (W B. D. 183) দেখেই বুঝতে পারলাম দাদার উপস্থিতি। রথীনকে বোল্লাম "দাদা আছেন রে, তোর ভাগ্য ভাল।"

উপরে উঠে এলাম—দরজা থেকেই দাদার হাসিভরা মুখ দেখতে পেলাম। ঘরে ঢুকে "দাদাকে" প্রণাম কোরলাম। রথীন প্রণাম করতেই ওর পরিচয় "দাদাকে" দিলাম।

তখন সেখানে বিভূতিদা ও রথীন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন—রথীনদার সাথে সেই আমার প্রথম পরিচয়—তিনি গভর্মেণ্ট আর্ট কলেজের অধ্যাপক ও একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টসের সেক্রেটারী। ভারতবর্ষের নাম করা শিল্পীর ছবি নিয়ে তিনি সারা ইউরোপ ও আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। নিজেও একজন উঁচুদরের শিল্পী—অন্যধারে অপূর্ব কণ্ঠের অধিকারী। সেতারও তাঁর হাতে ঝঙ্কারিত হয় অপূর্ব সুরের মূর্চ্ছনায়। বিখ্যাত বেহালাবাদক ইহুদী মেনুহীন, প্রেসিডেণ্ট কেনেডি, প্রেসিডেণ্ট রাধাকৃষ্ণন, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং আরও অনেক খ্যাতনামা ও বিখ্যাত অধিনায়কদের সামনে রথীনদা সেতার বাজিয়ে মন মুগ্ধ করেছেন সুরের ঝঙ্কারে।

রথীনদা এত গুণের অধিকারী হয়েও তাঁর কোন অহমিকা বা গুণের বাহ্যিক প্রকাশ নেই। এমনকি নেই কোন অসাধারণ হবার চেষ্টা। "দাদার" মুখের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে বসে থাকেন—

"মনে হয় 'দাদাকে' পলকে হারাই হারাই ভাব।" সমস্ত দৃষ্টি ও মন সদা জাগ্রত একটী লক্ষ্যে। সেই লক্ষ্য হচ্ছেন "দাদা"। রথীনদার বড় বড় চোখ দুটী আমি দেখেছি "দাদার" দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবের অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনায় সজল হয়ে ওঠে। 'দাদার' সামনে, অতিশান্ত, বিনীত ও অবনত চিত্তে বসে থাকেন।

রথীনদা বলেন—"দাদার আকর্ষণ" অতিশয় তীব্র! রথীনদা আরও বলেন, আমার কাজকর্ম্ম, আর কিছুই ভাল লাগেনা! সব সময়ই মনে হয় সব ছেড়ে "দাদার" কাছেই পড়ে থাকি। "দাদা" আমার কর্ম্মের সমাপ্তি করে তাঁর কাছেই টেনে নিন্ এই আমার কামনা। "দাদাকে একদিন না দেখলে মন অস্থির হয়ে ওঠে।"

"দাদা ভাই, সোণা ভাই, এদের সব কি উপায় হবে বলো দেখি? নিজেকে লুকিয়ে রাখলে তোমার আর চলবে না, ধরা তোমার দিতেই হবে—এদের শ্রদ্ধা ভক্তির কাছে। কোথায় যাবে তুমি? যত বড় ম্যাজিসিয়ানই হও না কেন তুমি এদের কাছ থেকে ম্যাজিকের খেলা দেখিয়ে পালিয়ে যেতে কিছুতেই পারবে না। এই আমি বলে রাখছি।" (রথীনদার কথাই আমি বিভূতিদার মাধ্যমে শুনেছি—সেজন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।)

"দাদা" রথীনদাসের সাথে আলাপ করতে লাগলেন ও চরণ জলের আশীর্বাদ দিয়ে ওকে আশীর্বাদ করলেন। অঙ্গগন্ধের সুবাসে ওর ঘড়ি সুগন্ধযুক্ত করে দিলেন। দাদা আমাকে আদেশ করলেন রবিবার দিন—রথীন ও তার স্ত্রীকে নিয়ে দাদার ওখানে যেতে।

দাদাকে প্রণাম করে আমরা বেরিয়ে এলাম। রথীন বল্লে "বৌদি দাদাকে যে কি ভালই লাগলো কি করে বোঝাব।"

এখন আর আমার দরকার হয় না, রথীনেরা নিজেরাই নিয়মিত "দাদার" কাছে যায়।

"দাদা ভাই" কত জ্ঞানী, গুণী লোক পরিবৃত হয়ে তুমি বসে

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

আছ—তোমার এই সামান্যা ছোট বোনটী তোমার স্নেহের কাঙ্গাল—তার থেকে তুমি তাকে বঞ্চিত কোর না। কি করে তোমায় একেবারে আপন করে পাবো! তাই বলে দাওনা "দাদা ভাই"—

অন্তরের প্রণাম তুমি গ্রহণ কোরো।

বল না হরি বল্
কোথা তোরে পাই।
কোন্ দিকেতে যেতে হবে
কোথা দিয়ে যাই।
খেলার ছলে, ছলে' ছলে'
কেবলি যাস্ দূরে চলে,
একেই কি তোর খেলা বলে,
জানতে আমি চাই।
হাত বাড়ায়ে ধরি ধরি
তুই কেবলি দাঁড়াস সরি।
আর তো আমি নাহি পারি
তোমার শরণ চাই।
চরণ পরে রাখো মোরে
অভয় যেন পাই।

২০শে জুলাই, রবিবার ১৯৬৯ সাল—সকাল ৮-৩০। দাদার ভবনে অষ্টাদশ দর্শন।

২০শে জুলাই—ভোরের আলো ফুটে উঠলো, মনও আনন্দে নেচে উঠলো দাদার ওখানে যাবো বলে। রবিবার দিন "দাদার" অন্য মূর্তি—বিভোর ভাব, সর্বদাই আত্মস্থ ও সমাহিত হয়ে আছেন। তারই মধ্যে কত উপদেশ কত অমৃতময় বাণী। সুন্দর সুন্দর কত শাস্ত্র ব্যাখ্যা

করে যান। মহাভাবের আবির্ভাব না হলে এরকম হোতে পারে না। মনে হয় সেদিন দাদার অন্তরে বিশেষ শক্তির প্রকাশ হয়। বিশেষ করে সেই জন্যেই ঐ দিনটা যেতে ভাল লাগে।

সকাল ৮-৩০ মিনিটের সময় রথীন, ওর স্ত্রীর ডলি, মিঃ গুহ ও আমি দাদার ওখানে গেলাম। দরজার কাছ থেকেই দাদার সেই হাসি ভরা মুখখানা দেখতে পেলাম। আয়ত চোখদুটীও আনন্দ উচ্ছ্বাসে উচ্ছসিত। গেরুয়া বসন পরিধানে অপূর্ব দেখাচ্ছে দাদাকে। হাসিভরা চোখ দিয়ে দাদা আমাদের কাছে ডাকলেন।

কাছে যেয়ে সর্ব অন্তর লুটিয়ে প্রণাম করে বোসলাম।

একটু পরেই এলেন মিসেস কে. সি. নিয়োগী, ডাঃ দে এর সাথে। মিঃ কে. সি. নিয়োগী ইংরাজ আমলে ২টী বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। সম্পর্কে দাদার স্ত্রীর জ্যেঠিমা। দেখলাম মিসেস নিয়োগী দাদাকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। দাদাকে অমিয়বাবা বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। তাঁর কথাবার্তায় আলাপ আলোচনায় বুঝতে পারছিলাম যে তিনি খুব উচ্চশিক্ষিতা ধর্মপ্রাণা। ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অধিকারিণী।

আমাদের বৌদির সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা হয়নি, সত্যিই কি প্রচণ্ড ত্যাগ বৌদির। দিনের পরে দিন নির্লিপ্ত ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন সংসারের। যে যাচ্ছেন তারই সাথে স্বল্পবাক্ বৌদি মধুর হেসে মিষ্টি কথায় আপ্যায়ন করছেন। যদি আমাদের দাদার সম্বন্ধেও কেউ কোন উপদেশ দেয় তাও তিনি খুশী মনেই মেনে নেন। ছোট একটু হাসি দিয়েই সব সমস্যার সমাধান করে দেন।

রাত নেই, দিন নেই, সময় নেই, অসময় নেই, সবারই সব রকম ঝঞ্ঝাট মাথা পেতে নিচ্ছেন। কোন রকম অসন্তোষ নেই। সত্যিকারের আদর্শ সহধর্মিণী।

"দাদা" দেহ ধরে এসেছেন। জাগতিক জীবনে যোগ্যা সহধর্মিণীর

সহযোগিতা না পেলে, ধর্ম জীবনে, আধাত্মিক জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিবন্ধক হয়। যোগ্যা সহধর্ম্মিণী—শক্তির অংশ। বৌদি "দাদার" জীবনে সেই শক্তির অংশ। তাঁকে অবহেলা করবার সাধ্য কারো নাই।

অতি সহজ, সরল, ভালমানুষ বৌদি আমাদের। তাই ছোট বোনটির আব্দার নিয়ে প্রায়ই দাদাকে বলি "দাদা বৌদি আপনার শক্তির অংশ। এ-জাগতিক জীবনে বৌদির অবহেলা কিন্তু করবেন না।"

"দাদা" বলেন, "না রে না, অবহেলা করবো না, কথা দিচ্ছি। বড় ভালমানুষ কিছুর মধ্যেই নেই।"

'দাদার', এই কথা শুনে বড় ভাল লেগেছিল।

আমরা "দাদার" কাছে বসে আছি, এমন সময় ডাঃ অনিল মৈত্রের বাড়ী থেকে খবর এলো, মিসেস মৈত্র বাথরুমে পড়ে যেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। যে লোকটি খবর নিয়ে এসেছিলো দাদা তাকে বল্লেন—সামনের মাধবীলতা গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এসো। পাতা এলে—পাতাটিকে চারখণ্ড করে ছিঁড়ে, সামনে রিপন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মিঃ দাশগুপ্ত বসে ছিলেন,—"দাদা" তাঁকে বল্লেন—এই পাতা থেকে ঘ্রাণ নিয়ে দেখতো—কিছু পাস নাকি? তিনি ঘ্রাণ নিয়ে বল্লেন "অপূর্ব চন্দন গন্ধ।"

লোকটিকে "দাদা" বল্লেন—"এটা নিয়ে মাইজীর বালিশের তলে রেখে দিও। আর বোলো, আমি তো ওখানেই আছি।"

লোকটি চলে যেতে "দাদা" আত্মস্থ ও বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। আশে পাশে এত লোক কোন দিকেই তাঁর দৃষ্টি নেই। প্রায় আধঘণ্টা পরে "দাদার" সে ভাব কেটে গেলে বল্লেন, "এখন ভাল আছে, তবে মাথায় বেশ লেগেছে।"

দশ মিনিট পরে ডাঃ মৈত্রের ছোট ভাই ডাঃ মানস মৈত্র দাদার

কাছে এলেন ওখান থেকে,—বল্লেন, "বৌদি এখন ভাল আছেন। মাথায় একটা জায়গায় চোট লেগে ফুলে গেছে।"

"দাদা" তুমি কি একই রূপে ভিন্ন দেহে ওখানে চলে গিয়েছিলে নাকি তখন মিসেস মৈত্রের কাছে? কি করে জানতে পারলে বলতো! সত্যিই এই পৃথিবীর কোথায় ও তো একটুকুও ফাঁক নেই, সব 'তুমি' দিয়ে ভরা। তোমার মহিমা আমরা কি বুঝতে পারি, বলতো। আপন মহিমায় আপনি মহিমান্বিত।

হে মহিমাময়! তোমার বিরাট বিশ্বরূপের গোলক ধাঁধায় চোখ বেঁধে ছেড়ে নিও না আমাদের। "বুড়ি" যেন ছুঁতে পারি সেই আশীর্বাদই কোরো।

রথীন ও রথীনের স্ত্রী সেদিন দাদার কাছ থেকে যা পেলো তাতে তারা মুগ্ধ বিমোহিত।

দাদাভাই, গোপালভাই, তুমি বল, তোমার মধ্যে যিনি আছেন, আমাদের মধ্যেও তিনি, সেই একজনই আছেন। তাই রোজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে, তোমার পিঠে ও গায়ে হাত বুলিয়ে দিই—মনে মনে কি ভাবি জানো 'দাদা'! যদি তোমার শক্তিতে আমরা কিছু শক্তি পেয়ে থাকি, তবে তোমার দেহের ভালমন্দের বোঝা আমরাও যেন নিতে পারি।

সেই জন্যেই রোজ তোমাকে ভাল থাকতে মিনতি করি, তোমার অঙ্গে হাত বুলিয়ে। তুমি ভাল থাকলেই যে আমরা সবাই ভাল থাকবো 'দাদাভাই'। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। তুমিই সব, আমরা যে আধার। তুমিই যে প্রাণের স্পন্দন, মনের গতি, জীবনের গান। ভাল, মন্দ, দ্বিধা দ্বন্দ, সব তুমি, তুমি ইচ্ছাময়।

"দাদার" অমৃতময় বাণীর কিছু অংশ লিখে আমি এই দিন লিপি শেষ করবো—দাদার কাছে আমার মনের প্রার্থনা জানিয়ে।

আমাদের দাদার বাণী—

"দাদা" বল্লেন—আমি একা একাই এসেছি (মনে মনে ভাবলাম একা, একা ঠিকই সব মিলে একক অখণ্ড ব্রহ্ম।)

আত্মস্থ দাদা আবার বল্লেন—এ সংসারে কিছুই নেই, সত্যও নেই, মিথ্যাও নেই, সব এক, এক জায়গায় যেয়ে সব শূন্য।

মনুষ্য শ্রেষ্ঠ জীব। আচার আচরণ পরম রস আস্বাদন কোরবার জন্যেই মানুষ জন্ম। তাকে নিয়ে আনন্দ কর আনন্দে থাক।

গুরু কে? গুরু কেউ হতে পারে না তিনি ছাড়া। তোমরা যা পেয়েছে বা পাচ্ছো, তোমাদের পাবার ছিল,—তাই তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছ—তিনিই তোমাদের গুরু—তোমরাও যার কাছ থেকে কৃপা পাচ্ছ, আমি ও সেই "একই" জনের কাছ থেকে পাচ্ছি—

আমি তোমাদের গুরু নই—আমি তোমাদের গুরু ভাই—তোমাদের "দাদা"—এক দেহ আর এক দেহকে দিতে পারে শুধু অহঙ্কার। মন্ত্র দেবার অধিকার কারো নেই একমাত্র "তিনি" ছাড়া! যাদের আচরণের নেই হদ্দিস তারা আবার শেখাবে কি?

পূজা জপ-তপের বহিঃপ্রকাশ, অহং সত্তারই প্রকাশ।

উপোস আবার কি? খাবে, দাবে স্ফূর্ত্তি করবে -মন পরিষ্কার রাখবে। তাঁকে কখনও অভুক্ত রাখবে না।

দেহ নিয়ে এসেছি দেহের ধর্ম দেহই করবে। যে যা ভাবনা চিন্তা করুক না কেন, একজায়গায় যেয়ে সবই এক।

যাওয়াও নাই, আসাও নাই। আসা যাওয়ার মাঝে এমন এক বন্ধু আছেন, যার যাওয়াও নেই, আসাও নেই।

জাতি, জাতি আবার কি, হিন্দুও নাই, মুসলমানও নেই, খৃষ্টানও নেই বৌদ্ধও নেই। চণ্ডালও নেই চামারও নেই—একজায়গায় যেয়ে সবই এক। একের থেকে বহু।

ব্রাহ্মণ আবার কে? যে ব্রহ্মে স্থিত সেই ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মতে সদানন্দ

ময়, তিনি ব্রাহ্মণ, সেই জ্ঞান কয়জনের আছে। চণ্ডালও কর্ম গুণে ব্রাহ্মণ হতে পারে। তীর্থ একটাই, সেটা দেহ তীর্থ। দেহ ধরে এসেছে বলেই মানুষ এত দৌড়াদৌড়ি ঝাপাঝাপি করে বেড়াচ্ছে।

মহাতীর্থ একটা জায়গায় আর সব মন তীর্থ-গম।

মনের মধ্যে যে হংস ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে নির্বিকার, নির্বিকল্প মনের আনন্দে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে।

সচল বাদ দিয়ে অচল নিয়ে ছোটাছুটি—সাথী তো সচলই।

ভেক্ ত্যাগের দরকার কি! গেরুয়া পরলাম, জটা রাখলাম। গেরুয়া পরে সবাইকে জানালাম আমি সাধু। জটা রেখে জটার ভার সামলাতেই অস্থির—"তাঁর" দিকে মন দেবো কখন?

তিলক লাগিয়ে কি হবে? আসলে মনের থেকে নবদ্বার বন্ধ করতে হবে—তবেই হবে আসল তিলক লাগানো। শ্রীগৌরাঙ্গদেব কখনও তিলক ধারণ করতেন না।

গঙ্গা কোথায়? তোমার দেহেই তো মহাগঙ্গা প্রবাহিত। তার জল একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। সুবাসিত—সুগন্ধীয় জল।

মুদ্রা যোগেরই অংশ। মন বুদ্ধি দিয়ে শাস্ত্র লেখা যায় না।

যোগ। সমস্ত দেহ মন একসাথে করা। সুগন্ধযুক্ত হলে সেই হোল মহাযোগ।

আমার "গোবিন্দ" যদি স্থিত অবস্থায় থাকেন তবে তাঁর সবই করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছা হলেই, সব কিছু সম্ভব। কর্তৃত্ব বোধে সম্ভব নয়। ডাঃ অনিল মৈত্রের বাড়ীতে যিনি ছিলেন স্বয়ং তিনি। দেহ নিয়ে যা করে অহঙ্কার।

প্রসাদ আবার কি? প্রসাদ তুমি নিজেই, নিজেই নিজের প্রসাদ। প্রসাদ আর কিছু হতে পারে না। সত্যনারায়ণ পূজা কি? যোগাবেশে সত্যকে আয়ন করা। সত্যনারায়ণ পূজার সিন্নি মানে কি! পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে বশে এনে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া। জগতের

কোথায় কোন ফাঁক নেই সব পূর্ণ—এতটুকু জায়গায়ও তিনি ছাড়া নেই।

সংসার ছেড়ে কোথায় যাবে! মহাদেব তো পূর্ণ সংসারী ছিলেন, গৃহী ছিলেন। যাগযজ্ঞ সব তো তিনি নিজেই। প্রসাদও তিনি নিজেই।

শাস্ত্রে আছে—বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যং
স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।

তার মানে এই নয় যে স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করবে না, বা রাজকর্মচারী, ও পুলিশকে বিশ্বাস করবে না। স্ত্রীষু হচ্ছে, নিজের মন। রাজকুলেষু হচ্ছে ইন্দ্রিয়াদি। মন ও চঞ্চল, ইন্দ্রিয়াদিকেও বশে আনা মুস্কিল, সেই জন্যেই ওই দু'টোকে বিশ্বাস করা যায় না।

স্ত্রী জাতি শক্তির অংশ। শ্রীরাধিকা না থাকলে শ্রীকৃষ্ণের লীলাই অসমাপ্ত।

স্ত্রী লোকই বা কে? পুরুষই বা কে? তাঁর কাছে সবই এক—কোন ভেদাভেদ নেই।

সুন্দর কে? দেহের সৌন্দর্য তো দু'দিনের। সুন্দর তিনিই—যিনি চির সত্য, চির নবীন, যাঁর লয়ও নেই, ক্ষয়ও নেই। তাঁরই আরাধনা করবে।"

দাদার সব বাণী ভাষায় রূপ দেবার মতন আমার সাধ্য নেই।

আমার মঙ্গলময় দাদা যখন এসব কথা বোলছিলেন, মহাভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ন চেহারা, দিব্য আলোর জ্যোতিতে দীপ্ত হচ্ছিল। সবাই আমরা নির্বাক তন্ময় চিত্তে দাদার মধুর বাণী শুনছিলাম। মাধুরী মৈত্রের কথাই ঠিক "দাদার কাছে এলে ঘি-টা মনের মধ্যে পড়ে আপনিই জ্বলে।"

মিসেস রেণু মৈত্র বলেন "দাদা" সাক্ষাৎ নারায়ণ। সেই আমার জীবনের পাথেয়, সেই আমার আনন্দ ও তৃপ্তি।

মিসেস অণিমা ঘোষ বলেন। সর্ব বিপদ থেকে "দাদাই" আমাদের রক্ষা করেন। তিনি বিপদ তারণ তারিণী হরি। ওঁর প্রসাদে আমরা ধন্য।

মিসেস কে. সি. নিয়োগী—"লীলামা" জ্যেঠিমা বলেন "ঈশ্বরী" শক্তির আবির্ভাব না হলে "অমিয় বাবার" এই রূপ দর্শন হোতনা। ওর মধ্যে তিনিই সশরীরে বিরাজমান।"

ভক্তজন মুখে শুনেছি 'দাদার" কাছে এলেই সব শান্তি। "দাদাকে" না দেখে থাকতে পারা যায় না। তিনি চির শান্তি, অখণ্ড ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ডময়।

কল্যাণময় "দাদার" কাছে যখনই গিয়েছি, পেয়েছি প্রাণের পরশ, মনের উত্তাপ। বহুবার, বহুভাবে বহুরূপেই তাঁর দর্শন পেয়েছি—মনের নিভৃত গোপন কোণে।

চোখ- মুদলে আলোয় আলোয় ভরে যায়, কত রূপের খেলাই করে যায়, মুদ্রিত চোখের সামনে, দূরে থাকলে দর্শন পাই নানা রূপে নানা ভাবে। মনের সংগোপনে অমূল্য রত্নের মতন যত্ন করে রেখে দিতে চাই, বাইরের ছোঁয়ায় যেন মলিন না হয়ে যায়।

প্রাণ, মন, সমর্পণ করে নিঃশেষে সব কিছু বিলিয়ে দিতে চাই, নিজের বলে কিছুই না রেখে। লোকলজ্জা, ভয় সব কিছু ত্যাগ করে তাঁকে পাবার নেশায় পাগল হয়ে খুঁজে বেড়াতে পারি সেই আশীর্বাদই করো তুমি "দাদা"। তোমার সন্তান আমি—সেই যেন হয় আমার বড় পরিচয়।

তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই ব্রহ্মময়ী। তুমি সচ্চিদানন্দময়, তুমিই সচ্চিদানন্দময়ী, তুমিই অখণ্ড পরম ব্রহ্ম। ধর্ম্ম স্থাপনের জন্যে যুগে যুগে তোমার আবির্ভাব। তোমারেই করেছি ধ্রুবতারা, এ সংসারে হবো নাকো পথহারা।

"দাদা!" আমি সাধনহীন, ভজনহীন, ভক্তিহীন—শুধু তোমার

চরণে আমার শুদ্ধা ভক্তি দান কর, আর দাও পূর্ণ বিশ্বাস! অন্তরের অন্তর দেবতা হয়ে, যুগে যুগে আমার অন্তরে বিরাজ করো।

আমার পরম স্নেহময় "দাদা ভাই", তোমার কাছে বহু জ্ঞানী, গুণী, ভক্তজন, বহু ডক্টরেট, বহু নামজাদা বিখ্যাত চিকিৎসক, পদস্থ কর্মচারী, উকীল, ব্যারিষ্টার, শিক্ষক ও শিক্ষিকার সমাবেশ।

বহু বিচারক তোমার বিচারের আশায় তোমার সামনে উপস্থিত। নাম করা ব্যবসায়ীগণ তোমার কৃপা প্রার্থী, তোমার কৃপার আশায় দণ্ডায়মান।

তার মাঝে অতি দীন হীন অজ্ঞ মূর্খ নারী তোমার আদেশে আমি আমার লেখনী ধরেছি। যদি কিছুমাত্র প্রকাশ করতে পেরে থাকি, সে শক্তি, তোমারই দেওয়া, সে মন "তোমারই" ভাবে পরিপূর্ণ।

"দাদা"! অন্তরে যে দীপটি জ্বেলে দিয়েছ, সে দীপের শিখা চির অনির্বাণ থাকুক, চির জাগরূক হউক হৃদয় মাঝে। অন্তরের উপলব্ধির চরম সীমায় যেন পৌঁছাতে পারি, সেই আশীর্বাদই ভিক্ষা করে তোমার কাছে তোমার দেওয়া রচনা শেষ করেছি। ভালমন্দ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সে তোমার বিচার, তুমি জান।

তোমার পায়ে রইলো আমার অন্তরের, যুগযুগান্তরের প্রণাম।
গোপাল তুমি, যুগাবতর তুমি, প্রণাম লহ সবাকার।

হে গোপাল! হে গোপাল! তুমি গোপাল,
প্রাণ গোপাল তুমি মন গোপাল।
কৃষ্ণ গোপাল তুমি, অনিন্দ্য গোপাল।
গোবিন্দ গোপাল তুমি, নয়ন গোপাল।

মনের আনন্দ মাঝে, তুমি আনন্দ গোপাল,
মনের গভীরে তুমি গোবিন্দ গোপাল।
বালকের কাছে তুমি, বাল গোপাল
মায়ের কোলেতে তুমি নন্দ গোপাল।

ভক্ত প্রাণে, জনে, জনে, মুকুন্দ গোপাল
রাখাল জন সনে তুমি চরাও গোপাল।
প্রাণের গোপাল, তুমি মনের গোপাল,
মনে প্রাণে আছ তুমি একই গোপাল।

ভূলোক দ্যুলোক মিলে গোবিন্দ গোপাল,
গোপীজন প্রাণে তুমি, রাধিকা গোপাল,
রাধিকার প্রাণে মনে অনন্ত গোপাল,
অনন্ত গোপাল, তুমি গোবিন্দ গোপাল।

নমো গোপালায়, গোবিন্দায় নমঃ নমঃ,
নমো সর্বজন পূজিত বন্দিত নমঃ নমঃ,
নমো গোপালায় নমঃ মানবায় নমঃ,
নমো গোপাল রূপেন সর্বজন নমঃ।

নমো গোপাল গোবিন্দায়
নমঃ গোবিন্দ গোপালায় নমঃ
নমঃ গোপাল রূপেন
শ্রীশ্রীঅমিয় জীবন 'কৃষ্ণায়' নমো।

———

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

[পরম শ্রদ্ধেয় 'দাদার' ভক্তমুখে যা শুনেছি ও শুনিয়েছেন—"দাদার" কৃপা বিভুতি ও অনুভূতি।]

আমাদের বিভূতি দা।

শ্রীযুক্ত বিভূতি সরকার (পি. এইচ. ডি) দাদার পরম ভক্ত ও অতি আপন জন! অগাধ পাণ্ডিত্য তার কিন্তু প্রকাশ কিছুই নাই। পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে দাদাকে দেখেন। অখণ্ড বিশ্বাসের বলে বলীয়ান।

'দাদার' সামনে চোখ বুঁজে বসে থাকেন নিজের ভেতর আত্মস্থ হয়ে। নিজের অন্তরে অনুভূতির উপলব্ধির মার্গে বিচরণ করেন। মনোরাজ্যে সব কিছুই তাঁর 'দাদা' দাদাময়।

সেই বিভূতিদার কাছে যা শুনেছি—'দাদার কথা' জানাতে চেষ্টা কোরছি, ভুলত্রুটী হয়তো অনেক আছে—বিভূতিদা যেন নিজ গুণে মার্জনা করেন।

(১) প্রথম দিন বিভূতিদার কাছে শুনলাম—বড়বাজারে বিড়লাদের ভাগ্নের বাড়ীতে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা উপলক্ষ্যে দাদার সাথে গিয়ে ছিলেন বিভূতি দা।

সেখানে প্রায় ১০০ জন 'নাম' পেলেন। মজা হচ্ছে এই যে যার যে ভাষা সেই ভাষাতেই নাম পেলেন। সবশুদ্ধ মিলিয়ে ১১টি ভাষা। কথা হচ্ছে এই যে, জাগতিক দেহে 'দাদা' এতগুলি ভাষাতে পারদর্শী নন।

"দাদা" বিভুতি যোগে ছোট লাইন টানা কাগজের টুকরার মধ্যে নাম দান করেন। সেই নাম আসে সেই শক্তিময়ের কৃপায় আপন ইচ্ছাতে। যে যার হাতের কাগজখানি খুলে নাম দেখতে পান। যার না পাবার থাকে তিনি বঞ্চিত হন। এই বিড়লা ভবনে সবাই যার

যার ভাষায় নাম পেলেন, এর তাৎপর্য কি? তিনি একক অখণ্ড। "তাঁর" মধ্যেই সব বিরাজমান নয় কি?

(২) বিভূতিদার জ্বর হয়েছিল—১০৫° ডিগ্রী, শরীরে অসহ্য যাতনা। চোখ বুজে পড়ে ছিলেন, চাইবার ক্ষমতাও ছিলো না। হঠাৎ অঙ্গগন্ধের সুবাসে ঘর ভরে উঠলো,—দেখিলেন "দাদা" এসে মাথার কাছে দাঁড়িয়েছেন ও চরণজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন তাঁর দেহে। আস্তে আস্তে বিভূতিদার সব ক্লান্তির অবসান হোল ও টেম্পারেচার নিয়ে দেখা গেলো জ্বর নেমে গেছে। ভক্তের কষ্ট ও যাতনা দেখে পরম স্নেহময় দাদা স্থির থাকতে পারেন নি, ছুটে এসেছেন নিজেই। সন্ধ্যা তখন সাড়ে সাতটা।

আবার সেই সময় মঞ্জু চক্রবর্তী দেখতে পাচ্ছে "দাদা" তাদের বাড়ীতে পূজা কোরছেন।

সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে দাদাকে দেখা গেলো ডঃ অনিল মৈত্রের বাসায় চা খাচ্ছেন। সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করতে না পারলে এও কি সম্ভব! অসীম শক্তির অধিকারী না হলে, প্রকৃতির সাথে নিজেকে মিলিয়ে না দিতে পারলে "ইচ্ছাময়ের" ইচ্ছা পূরণ হতে পারেনা!

(৩) বিভূতিদা একদিন রাত ৮॥০ টার সময় "দাদার কাছ থেকে টেলিফোন পেলেন "তোমরা সবাই কেমন আছ?"

বিভূতি দা যখন বলছেন 'আমরা সবাই ভালই আছি।' ঠিক ওই সময় ওর ছেলে প্রবীর ছুটতে ছুটতে এসে বললে "আমি আজ এক্ষুণি বড় বেঁচে গেছি। কার ফোন—দাদার? "দাদা" সর্বজ্ঞ তাই তিনি ফোন করেছেন। "দাদাকে" বলো বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের কাছে রাস্তা পার হচ্ছিলাম, তখন অসম্ভব বেগে চলন্ত ট্যাক্সির নীচে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। কি করে যে বাঁচলাম জানিনা, মনে হোল কেউ জোর করে রাস্তার পাশে ঠেলে

ফেলে দিলো। এ নিশ্চয়ই দাদারই কীর্তি। দাদা সব জেনে শুনেই ফোন করেছেন।"

এতটুকু স্কুলের ছেলের মনেও কি গভীর বিশ্বাসের আসন দাদা পেতে বসেছেন। ধন্য তুমি "দাদা"।

(৪) বিভূতিদার ছোট ছেলে প্রবীর ও তার বন্ধু শান্তি, স্কুলের অবকাশে—আসামের "খারাবাড়ী" চা বাগানে বেড়াতে যাবে বলে ঠিক করলো—"দাদার' খুব ইচ্ছা ছিলো না ওরা যায়। টিকিট হয়ে গেছে—ছেলেমানুষ দুঃখ পাবে বলে ওদের যেতে মানা করলেন না। আসাম রওনা হবার আগে দাদা হাত উঁচু করে হাতের মুঠোতে এসে পড়া একটি জিনিষ প্রবীরের হাতে দিয়ে আদেশ করলেন—সব সময় কাছে রেখে দিতে।

আসামে যাবার পথে তিস্তা নদীর ব্রীজ পার হতে হয়। বন্যার প্রকোপে ব্রীজের ওপরে কোমর জল, ট্রেন যাবার সাধ্য নেই। ট্রেণের যাত্রা স্থগিত হোল সেইখানেই।

প্রবীর ও শান্তি মালপত্র মাথায় নিয়ে প্রায় বুক জল ঠেলে, সেই তিস্তার দুরন্ত স্রোতের মধ্যে দিয়ে রেলওয়ে ব্রীজ পার হয়ে চলে এলো ও বহুকষ্টের পর তারা দু'জন গন্তব্যস্থল "খারাবাড়ী" এসে পোঁছায়। রাত্রে শুয়ে আছে ঘরে খাটের উপরে ; হঠাৎ ওর বন্ধু শান্তির পায়ে পাহাড়ী কাঁকড়া বিছে কামড়ায়। কামড় খেয়ে ভয়ে শান্তি লাফিয়ে খাট থেকে নামতে যায়, ওর হাঁটুর জয়েণ্ট খুলে যেয়ে চলৎ-শক্তিহীন ও যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে প্রবীরের দাদার দেওয়া জিনিষটার কথা মনে পড়ে যায়। সে নিজের পকেট থেকে জিনিষটি নিয়ে ওর বন্ধুর পকেটে রেখে দেয়, যদি বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে এই ভেবে।

সত্যিই তার পরেই শান্তি পা একটু সরাবার চেষ্টা কোরতেই হঠাৎ হাঁটুর সরে যাওয়া হাড়টি ঠিক জায়গা মতন এসে সেট করে যায় ও

যন্ত্রণার অবসান ঘটে। পরে গৌহাটীতে ডাক্তার দেখে বলেছিলেন হাঁটুর ডিস্‌লোকেশান হয়েছিলো।

প্রবীরের ধারণা দাদার ঐ জিনিষটী সাথে থাকাতে, বিপদের মধ্যে পড়েও বিপদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

বিভূতিদা বল্লেন 'দাদা নাকি কোলকাতায় বসেই ওদের বিপদের কথা বর্ণনা করছিলেন সব বিপদ কেটে গেছে তাও বলেছেন'।

"বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহুদূর।"

(৫) কিছু দিন আগে পানিহাটি প্রবর্তক জুট মিলে সোহন লাল মল মহাশয়ের বাড়ীতে "দাদা" শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা উপলক্ষ্যে গিয়েছিলেন। সাথে ছিলো মাধুরী মিত্র, মিনুদে, ডাঃ দে, বিভূতিদা ও অন্যান্য সবাই।

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণজীর মন্দিরে পূজোর আয়োজন হয়েছিলো।

বিভূতিদার কাছে শুনলাম মিনু নাকি সজ্ঞানে, সচক্ষে দেখলে, মন্দিরে যেখানে সত্যনারায়ণজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত সেখানে মূর্তি নেই, "দাদা" বসে আছেন। ধূপের ধোঁয়ায় ও সুগন্ধে চারিদিক আচ্ছন্ন। এই দেখে মীনু অজ্ঞান হয়ে যায়। মিনু 'দাদার' খুবই ভক্ত,—সব সময়ই 'দাদার' সাথে সাথে থাকে।

তারপর বিভূতিদা নিজের কথা বল্লেন "চোখ বন্ধ করে বসে আছি, উপলব্ধির অনুভূতিতে মন আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। দেখলাম "শিখি পাখা শিরে, মোহন মুরলীধারী বঙ্কিম শ্যাম, পীতবসনধারী, গলে দোলে বনফুলমালা, চরণে নুপুর ধ্বনি বাজিছে রুনু ঝুনু,—সিংহাসনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এদিকে সিংহাসন থেকে নেমে আসছেন "দাদা", সোনার মুকুট শোভে শিরে, গলে দোলে গজমতি হার, গৌর ও উজ্জ্বল তনু, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী, দুজনে দু'জনের দিকে এগিয়ে এসে এক সাথে মিলে মিশে এক হয়ে গেলেন। চারিদিক

ধোঁয়ায় ও সুগন্ধে, আছন্ন হয়ে গেলো। স্বয়ং প্রভু জানিয়ে দিলেন আমি যেই, তিনি সেই।

বিভূতি দা হয়তো অনেক কিছু দাদার সম্বন্ধে জানেন। আমি যেটুকু তাঁর কাছে শুনেছি তাই লিপিবদ্ধ কোরলাম।

আমাদের অণিমাদি—

(১) ডাঃ বি. পি. ঘোষের সহধর্মিণী। 'দাদার সখী, "দাদার" সঙ্গের সাথী, জ্ঞানী ও মহাভক্তিপ্রাণা, সেই অণিমাদির কাছে শুনেছি, "দাদা" সব সময়ই তাঁদের রক্ষা করছেন।

অণিমাদিদের বেনারস যাবার কথা ছিলো, কয়েক দিনের জন্যে। যাবার আগে কি একটা আশীর্বাদী জিনিষ ও'দের সাথে রাখতে দিয়েছিলেন—"দাদা"। দাদার আদেশ ছিলো সব সময়ই সেটা অণিমাদির সাথে রাখতে। বেনারস পেঁাছে হঠাৎ দেখেন সেই জিনিষটি হারিয়ে গেছে। সেই দিনই হোল ওদের সাইকেল রিক্সার দুর্ঘটনা—খুব জোরে ধাক্কা লেগেছিলো, কিন্তু সবাই ছিলেন অক্ষত। ওদের অক্ষত থাকবার কথা নয়—কি করে যে বেঁচে গেলেন তাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে দাদার কথা মনে পড়লো।

"দাদা" নাকি বেনারস থেকে ফিরে এলে বললেন—"কি কষ্টটাই দিয়েছিস তোরা আমাকে "ঐটা" হারিয়ে। সব সময়, সব জায়গায় আমাকে সাথে ঘুরতে হয়েছে, তোদের আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।"

যেদিন বেনারসে দুর্ঘটনা ঘটে "দাদা" নাকি ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় রায়ের বেহালার বাড়ীতে বসে ঠিক সেই সময় অ্যাকসিডেণ্টের বিবরণ বর্ণনা দিচ্ছিলেন—অনেকের মুখেই শুনেছি।

ভক্তের আঘাত লাগলে, ভগবানেরও ব্যথা লাগে—সেই আঘাত থেকে রক্ষা করতে সব সময় তিনি উন্মুখ।

(২) বেনারস থেকে ফিরে আসবার পর অণিমাদি বল্লেন,

গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সাথে দেখা করেছিলেন। ওঁনারা দাদার কথা বলতেই বল্লেন, "ওতো সাক্ষাৎ নারায়ণ। ১৪ বৎসর যখন ওর বয়েস তখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়—'বাবার' প্রকাশ হওয়ার কথা ছিলো ১৯৭২ সালে, এত তাড়াতাড়িই প্রকাশিত হলেন ?"

গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এখন বয়েসের ভারে বৃদ্ধ, ওঁর মতন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ভারতবর্ষে নেই।

(৩) আরেকদিন অণিমাদির কাছে শুনলাম, 'দাদা' যখন ওদের বাড়ীতে বসে ঘোলের সরবৎ খাচ্ছেন ঠিক সে সময়ই মঞ্জু ফোন করে বলছে—"দাদা" ওর বাড়ীতে আছেন—ওখানে বসে চা খাচ্ছেন।

"দাদা" খণ্ড খণ্ডরূপে তুমি যে অখণ্ড। ভক্তজন তুষ্টি তরে ধর খণ্ডরূপ।"

আমি সব সময় যেতে পারিনা তাই অনিমাদির সাথে দেখা হয় কম। তা না হলে আরও কিছু হয়তো জানতে পারতাম! এর চেয়ে বেশী শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। বর্ণনাতে যদি কিছু ভুল থাকে, তিনি আমাকে যেন ক্ষমা করেন। তাঁর ক্ষমা মানেই "দাদারই" ক্ষমা।

আমাদের স্নেহের মিনু

(১) ডাঃ মধুসূদন দে-র স্ত্রী, অণিমাদির ছোটবোন। অতি ভক্তিমতী, নিজের বিশ্বাসে পরিপূর্ণ—"দাদার" পার্শ্বসহচরী। কত সময় মিনুকে দেখেছি নাম গান করতে করতে বা শুনতে শুনতে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ভক্তিতে। সংসারের কাজ সেরে কতক্ষণে "দাদার" কাছে আসবে সেই দিকেই ওর প্রাণ পড়ে থাকে। কতরূপে সে—"দাদাকে" নিজের অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করেছে। আমি ধন্য, তাঁদের বাড়ীতে পূজার দিন "দাদার" কাছে নাম পেয়েছি।

মিনুর কাছে শুনেছি ওর নিজের অসুখ ও ডাক্তার দে-র অসুখ "দাদাই" একেবারে নিরাময় করে দিয়েছেন। "দাদার" প্রতি

ডাক্তার দে-র অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস। মীনু আমাকে বললে "একদিন রাতে পেটের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছি, এই ব্যথা মাসের মধ্যে কয়েকদিন ছাড়া আর সব সময়ই থাকে। হঠাৎ সকালে উঠে "দাদার" ফোন পেলাম—"কিরে কেমন আছিস? কালরাত্রে খুব কষ্ট পেয়েছিস বুঝি? আচ্ছা পেটে চরণ জল মালিশ করে দে, আর যে নাম পেয়েছিস তাই মনে মনে কর।" মীনু বল্‌লে "অদ্ভুত, রেণুদি জানেন 'দাদার" কথা মেনে তার পর থেকে আমি ভাল আছি।"

(২) ডাঃদের ঘাড়ের একটা হাড় সরে যেয়ে খুব যন্ত্রণা, ঘাড় নাড়তে পারেন না। কত চিকিৎসা কিছুতেই সারে না। নানা রকম চিকিৎসা চলতে থাকে নানা ভাবে। ডাক্তার দে-র পরামর্শে গাড়ী চালানো বন্ধ। ডাক্তার দে নিজেও ডাক্তার, ভেবে আর কূল কিনারা পাননা। ইতিমধ্যে "দাদার" আবির্ভাব। চরণ জল পান ও মালিশ ঔষধ। ডাক্তার মানুষ প্রথমে বিশ্বাসই করতে চান না—যাই হোক তারপর দাদার ঔষধ ও আশীর্বাদেই কাজ হয়। দাদার আশীর্বাদে আবার গাড়ী চালাচ্ছেন—শারীরিক কষ্ট কিছু নেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন।

অখণ্ড বিশ্বাসই মানুষকে সকল বিপদ হতে মুক্ত করতে পারে। চাই শুধু অসীম নির্ভরতা।

আমাদের প্রিয় কণা—

মিসেস কণা সেনগুপ্তা। "দাদার" নীরব ভক্ত। "দাদা" যা বলেন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে কোন দ্বিধা না রেখে। "দাদা" ওকে বলেন "অতি উত্তম।" কণা একদিন আস্তে আস্তে বোলছিলো—"সবাই শুনি দাদার অঙ্গগন্ধের সুবাস বাড়ীতে বসেই পায়। কই "দাদা" তো আমাকে কিছু দিলেন না? মনে মনে এই কথা সারাদিন চিন্তা কোরেছি, সেদিন বিকালবেলা কিছু কাজে বাড়ী

থেকে বেরিয়েছিলাম। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে দেখি, আমার ঠাকুর ঘর ধূপের ধোঁয়ায় ও সুগন্ধে, আমোদিত হয়ে আছে। কি অপূর্ব স্নিগ্ধ গন্ধ, সারা বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এতদিনে আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেলো। "ইচ্ছাময়" তিনি আমার ইচ্ছা পূরণ করলেন।"

স্বল্পবাক কণা বেশী কথা বলেন না, যেটুকু প্রকাশ করলো গভীর অন্তরের শ্রদ্ধার সাথেই প্রকাশ করলো।

আমার মিতা রেণু মৈত্র—

(১) ডাক্তার অনিল মৈত্রের স্ত্রী। স্বামী, স্ত্রী দু'জনের উপরেই অসীম কৃপা "দাদার"। তাদের সংসারের সবাই "দাদার" জন্যে পাগল—সব সময়ই সবার মুখেই শোনা যায় "দাদা" "দাদা" এই ছাড়া কথা নেই।

"দাদাকে" নিবেদন না করে ডাঃ ও মিসেস মৈত্র জল গ্রহণ করেন না। প্রায় প্রতিদিন দু'বেলাই "দাদা" ও বাড়ীতে আসেন। সকাল বেলা "দাদা" নিজে এসে খাদ্য গ্রহণ করলে তবে ওরা প্রসাদ পান না হলে সারাদিনই অভুক্ত থাকেন। যেদিন "দাদা" না যেতে পারেন "দাদার" আদেশে হয়তো খাদ্য গ্রহণ করেন।

"দাদা" এদের ভক্তির কাছে বাঁধা পড়ে আছেন। না এসে উপায় নেই। সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে "দাদাকে"—ডাঃ মৈত্র ও মিসেস মৈত্র নিজেদের অন্তরে স্থান দিয়েছেন। একদিন তাঁকে না দেখলে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ধন্য ডাক্তার মৈত্র ও মিসেস মৈত্র ; "দাদার" কৃপা লাভে ধন্য দম্পতি। "দাদার" পদধূলিতে তাঁদের আবাস মন্দিরে পরিণত হয়েছে।

অতি শান্ত স্বভাব ও মিষ্টভাষী মিসেস মৈত্র একদিন বোলছিলেন ওর মা খুব অসুস্থ ও মৃত্যুশয্যায় এর জন্যে ওর দাদা বহরমপুর থেকে দেখতে এসেছেন।

আমাদের দাদা ওদের বাড়ীতে বসে আছেন, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। হঠাৎ "দাদা" বলে উঠলেন "যাঃ হয়ে গেলো, শেষ হয়ে গেলো।"

মিসেস মৈত্র ভাবছেন বুঝি "উনি", তাঁর মায়ের কথা বল্‌ছেন। দাদা বল্‌লেন "বহরমপুরে তোমার ভাইবউ মারা গেলেন, শিগ্‌গীর তোমার দাদাকে রওনা হয়ে যেতে বলো।"

মিসেস মৈত্র বল্‌ছেন, "আমরা তো অবাক, ভাবছি "দাদা" কি বল্‌ছেন বৌদি তো সুস্থ।" অথচ "দাদার" কথা অবিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর আদেশ অনুসারে মিসেস মৈত্র নিজের দাদাকে খবর পাঠালেন বৌদি অসুস্থ, বহরমপুরে চলে যেতে।

আমাদের কল্যাণময় "দাদা" তাঁর তৃতীয় নেত্র দিয়ে দেখে মৃত্যু থেকে দাহ পর্যন্ত যত ঘটনা বিস্তারিত বলে যেতে লাগলেন। সত্যিই তার পর দিন ট্রাঙ্ককলে খবর পেলেন "দাদা" যে সময় বলেছেন, ঠিক সেই সময়ই মিসেস মৈত্রের বৌদি দেহ ত্যাগ করেছেন।

"দাদা" এত দূর থেকেও বিস্তারিত সব বর্ণনা দিয়ে গেলেন—"দাদার কাছে সব সমান, দূরও নেই, নিকটও নেই—"তাঁর" কাছে সবই শূন্য।"

(২) মিসেস মৈত্র আর একদিন বোল্‌ছিলেন ভেতরে রান্না ঘরে রান্না করছেন, বাইরের সদর দরজা বন্ধ রয়েছে। কিছু কাজ পড়াতে বাইরের ঘরে এসে দেখেন "দাদা" বসে আছেন—বাইরে সদর দরজা যেমন বন্ধ তেমনি বন্ধই আছে। "দাদা" কি করে ভিতরে ঢুকলেন বিস্ময়ে অবাক।

দাদা বল্লেন "কি অবাক হচ্ছ কেন এমনিই ভেতরে ঢুকে এসেছি।"

অণু, পরমাণু, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর জিনিষে তুমি বিরাজমান, তোমার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই 'দাদা"।

(৩) মিসেস মৈত্রের বাথরুমে পড়ে সর্বশরীরে আঘাত পান।

সর্বশরীর ও মাথায় অসহ্য ব্যথা। দাদার আশীর্বাদ ও চরণ জলের চিকিৎসা চলতে থাকে। মিসেস মৈত্র বাইরের ঘরে একা একটা খাটে শুয়েছিলেন দাদার আদেশে। "দাদা"আস্‌তে বল্লেন 'আমার একা শুতে ভয় করে "দাদা"। "দাদা" বল্লেন ভয় কিরে আমি তো তোর সাথে সর্বদাই আছি—তোর গোপাল হয়ে তোর পাশেই শুয়ে থাকবো তিন দিন।"

মিসেস মৈত্র বল্‌লেন "জানেন রেণুদি, আশ্চর্য ব্যাপার। আমি পাশ ফিরে শুয়ে থাকি মনে হয় আমার পাশে ছোট্ট শিশু শুয়ে আছে। মাতৃ স্নেহে আমার মন উদ্বেলিত হয়—দাদার কথা "দাদা" ঠিকই রেখেছেন—আমরা কিছু বুঝতে পারি না।"

মিসেস মৈত্র বোলছিলেন "দাদার" সুবাসিত অঙ্গ গন্ধে আমোদিত হয়ে থাকে তাঁর মনোমন্দির—গৃহও মন্দিরে রূপ নিয়েছে দাদার উপস্থিতিতে দাদার আশীর্বাদ যা পেয়েছেন তাতেই তিনি অতি পরিতৃপ্ত। দাদা তো মানুষ নয়—তিনি নরনারায়ণ, তিনি ভগবান। রোজ দাদা যাবার সময় নিজের হাতে 'দাদার' চপ্পল পায়ে দিয়ে দেন অতি ভক্তি ভরে।

মিসেস মৈত্রের কাছে শুনেছি, শুধু তিনি নন—জাষ্টিস পি. বি. মুখার্জীও দাদাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করেন। বহু ভাবে তাঁকে আদর করেন ও 'দাদাকে' খাইয়ে দিয়ে মনোবাসনা পূর্ণ করেন।

আমি নিজে দাদাকে বলতে শুনেছি, মিসেস মৈত্রকে বলছেন—"আমি তোর মা, আমি তোর বাবা, আমি তোর স্বামী, আমি তোর সন্তান, আমি তোর দাদা, আমি তোর ভাই, আমিই তোর বোন, আমিই তোর বন্ধু, আমিই তোর সখা, আমিই তোর গোপাল, একধারে আমিই সব হয়ে আছি।"

দাদার এই উক্তিতে মনে হয় মিসেস মৈত্র ও ডাক্তার মৈত্রের অন্তরে ও বাহিরে সব জায়গায় মিলে মিশে একাকার হয়ে আছেন তিনি।

আমাদে সতী সিনহা—

সতী স্যোশাল কাজ করে, সব সময়ই কর্ম ব্যস্ত। দাদাকে গভীর শ্রদ্ধা করে কিন্তু বাইরে প্রকাশ নেই।

একদিন ও বোলছিলো দাদার সাথে একটি বাড়ীতে পূজাতে গিয়েছে, সেবাড়ীর মহিলার গঙ্গাজল নেই বলে আপশোষ।

"দাদা" বল্লেন "গঙ্গাজল চাও? পাবে।" বলে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইলেন। একটু পরে আত্মস্থ হয়ে বললেন—যাও দেখো গিয়ে তোমার পূজার ঘরে গঙ্গাজল রয়েছে।" ভদ্রমহিলা পূজার ঘরে যেয়ে দেখেন, সুবাসিত ও সুগন্ধ জলে ঘর ভেসে যাচ্ছে তখন দাদার পায়ে এসে নিজেকে লুটিয়ে দিলেন।

"দাদা" কারো কোন মনোবাসনা অপূর্ণ রাখেন না—স্নেহময় তিনি।

আমাদের ঊষাদি—

মিসেস উষা সেনগুপ্তা যার মাধ্যমে আমার "দাদাকে" আমি আবার ফিরে পেয়েছি।

ঊষাদির কাছে শুনলাম, আমাদেরই এক বন্ধু গীতা সিন্‌হার ভাইপো, দুরারোগ্য পোলিও ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলো—ডাক্তাররা সবাই জবাব দিয়ে দেন। শিলিগুড়ি থেকে কোলকাতা নিয়ে আসবার পর দাদার চরণজলের ঔষধের চিকিৎসা চলছে। এখন অনেক ভাল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। ডাক্তররা দেখে অবাক।

'মহাজনের' মহা ঔষধ, সর্বশক্তিময়ের চরণজল—বিশ্বাসের সাথে যে ব্যবহার করবে সে নিশ্চয়ই উপকার পাবে।

'দাদার' মাধুদি, আমাদের মাধু!

(১) ডাক্তার মানস মৈত্রের স্ত্রী মিসেস মাধুরী মৈত্র, দাদার অতি প্রিয়জন, অন্তরঙ্গ সাথী, আবার 'দাদার' অভিমানিনী ছোটবোন। অন্তরে রামরূপে 'দাদা' বিরাজমান। মহাভাবে সর্বদাই উন্মনা পাগল।

ওর গাগলামী দেখতে খুব ভাল লাগে। 'দাদাই' ওর ধ্যান জ্ঞান। যেখানে যত বিপদই হোক না কেন, 'দাদার' কাছে এসে বসে থাকবে, বলবে 'ছোটাছুটী করে কি হবে? যিনি দেখবার তাঁর কাছেই এলাম।' কি গভীর বিশ্বাস, বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়।

আবার দাদাকেও সহ্য করতে হয় অভিমানের প্রচণ্ড দাপট। অভিমান হলে সে দাদাকেও মান্য করবেনা। মহাভাব না হলে ঐরূপ ভাব হতে পারে না। মাধু যখন গান করে ভগবানের প্রেমে আত্মহারা হয়ে যায়। সেই মাধুর কাছে দাদার বিভূতি সম্বন্ধে যা শুনেছি তাই জানাচ্ছি।

আমার জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ, এই লেখনীর ভাষায় হয়তো ভুল হতে পারে। মাধু যেন নিজ গুণে ক্ষমা করে নেয়।

(১) মাধুর ছেলের অসুখ—ডাঃ অনিল মৈত্রের (ডাক্তার মানস মৈত্রের দাদা) মহাশয়ের মাধ্যমে দাদার সাথে পরিচয় মাধুর। প্রথম থেকেই গভীর বিশ্বাস দাদার উপরে। কিন্তু ডাক্তার মানস মৈত্রের তেমনি অনাস্থা তখন—ডাক্তার মানুষ, তারপর বিদেশ ফেরৎ বড় সার্জেন। ডাক্তারী শাস্ত্রই সব চেয়ে বড় বলে মনে করেন। অন্য কিছুতে মোটেই বিশ্বাস নেই।

মাধুর একমাত্র ছেলের হোল বসন্ত, তার সাথে ১০৫° ডিগ্রী জ্বর। চোখের ভিতর বসন্ত হয়ে চোখফুলে ও বুজে গেছে। চোখ যায় যায় অবস্থা। অবস্থা খুবই খারাপ। বহু বড় বড় ডাক্তার ও বন্ধুবান্ধবে বাড়ী ভর্তি। মাধুর তখন একমাত্র লক্ষ্য কোথায় দাদাকে পাবে, ফোনের পরে ফোন করে চলেছে। ওর অখণ্ড বিশ্বাস 'দাদা' আস্‌লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বিপদের ত্রাণ কর্তা যিনি, সেই বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন এলেই অকূলে-কূল। 'দাদাকে' ফোনে পেয়েই মাধু ছেলের কথা বলে ওর মুখ চেয়ে তাড়াতাড়ি আসবার জন্যে অনুরোধ জানালো।

এদিকে 'দাদা' ততক্ষণে ওদের ওখানে এসে গেছেন। তবে মাধু ফোনের ও প্রান্তে কার সাথে কথা বল্লে ?

তিনি যে সর্বময়, অবাধ স্বচ্ছন্দ তাঁর গতি বিধি। 'দাদাকে' দেখে ডাঃ মানস মৈত্র একটু ভুরু কুচকে তাকালেন। মনে হোল ভাবলেন কোলকাতার সেরা সেরা ডাক্তাররা এখানে, এই সময় উনি আবার এখানে কেন ? তবু একমাত্র সন্তানের এত বড় বিপদ, কিছু বলতে পারলেন না। সবারই লক্ষ্য পড়লো, এই সুন্দর, গৌরবর্ণ চেহারার ভদ্রলোকটি কে ?

দাদা এসে বড় বড় ডাক্তার সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন ও মাধুর ছেলেকে নিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘণ্টা-খানেক পরে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, সবাই দেখলো ছেলে শান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে। ঘর অপূর্ব সুগন্ধে ভরে গিয়েছে। টেম্পারেচার নিয়ে ডাক্তাররা দেখলেন জ্বর ৯৭° ডিগ্রীতে নেমে গেছে। তখন অনেক নামজাদা ডাক্তার ওখানে ছিলেন। সবাই 'দাদাকে' প্রণাম করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ডাক্তারী শাস্ত্র যে একেবারে ফেল ফেলিয়ে দিয়েছেন 'দাদা'। ডাঃ মানস মৈত্রের মনে তখনও কিন্তু বিরূপ ভাব রয়ে গেছে—খুব ভালমনে মেনে নিতে পারেন নি তিনি।

মাধুর কাছে শুনেছি, পরে দাদা মাধুর ছেলের মুখে হাত বুলিয়ে বসন্তের দাগগুলিও মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

অসুখের জন্যে মাধুর ছেলের চোখের পাওয়ার হয়ে গেলো—৭। অনেক চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসা করেছেন কিন্তু কিছুই করতে পারেন নি। 'দাদার' চরণজলের চিকিৎসায় এখন খালি চোখেই পড়তে পারে। মাধুকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কোন ডাক্তার চিকিৎসা করেছেন, মাধু বলে, ইণ্টার ন্যাশনাল সব থেকে বড় চোখের ডাক্তার।

(২) দাদার পেটে ব্যথা—

ডাঃ মানস মৈত্র ও মাধুর মধ্যে একটা প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে দাদাকে নিয়ে। ডাঃ মৈত্র তখনও দাদাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি। সাক্ষাৎ নারায়ণ ভাবা তো দূরে থাক।

"দাদা" অন্তর্যামী' সবই জানেন। এতদিনে মাধুর পরীক্ষা শেষ করে এবার মাধুর স্বামীকে ডাকবেন বলে ডাঃ অনিল মৈত্রকে বল্লেন, "তোর ছোট ভাইকে পাঠিয়ে দিস তো? সার্জেন মানুষ, আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে একটু দেখে যাবে।" বড় ভাইএর আদেশ অমান্য করতে না পেরে, ডাঃ মানস মৈত্র দাদাকে দেখতে এলেন, দাদার বাড়ীতে—সাথে মাধু। দাদার সামনে যেয়ে এক আনল কপালে ছুঁইয়ে নমস্কার করলেন ডাঃ মৈত্র। তারপর ডাক্তারের কর্ত্তব্য করতে লাগলেন। যেখানে টিপে দেখেন সেইখানেই পেট শক্ত,—জিজ্ঞাসা করলেন 'ব্যথা লাগছে?" "দাদা" বললেন, না তো—আর ডাক্তাব মৈত্র বলছেন, "আমি দেখছি ব্যথার স্পেজম হচ্ছে আপনি না বল্লেই হোল?"

দাদা বললেন "আচ্ছা তাহলে ব্যথা কমাবার ঔষধ দাও, প্রেসক্রিপশান করে দাও" ডাঃ মৈত্র ঔষধের প্রেসক্রিপশান করে দিলেন। একটু পরেই অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেলেন, যে যে ঔষধ লিখে দিয়েছেন সেই সব ঔষধ, কোথা থেকে যেন "দাদার" হাতে এসে পড়েছে—উপর থেকে। তখন ডাক্তার মৈত্র বুঝতে পারলেন,—ইনি তো সামান্য কেউ নন, স্বয়ং তিনিই।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে সাষ্টাঙ্গে "দাদার" পায়ে উপর লুটিয়ে পড়লেন।

স্নেহময় দাদা অতি স্নেহের সাথে ডাঃ মৈত্রকে এই ভাবে কাছে টেনে নিলেন। ডাঃ মানস মৈত্রকে নিজের মুখে বলতে শুনেছি "দাদা নারায়ণ কি ভগবান তা জানিনা—তবে ২।৩ দিন "দাদাকে" না দেখলে মন অস্থির হয়।

(৩) [ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়ে ডাঃ দের বাড়ীর শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজার দিন 'দাদা'' মাধু ও ডাঃ মৈত্রকে যে নিয়ে এসেছিলেন সে কথা আগেই লিখেছি।—(১১ই মে) দাদার তৃতীয় দর্শনে]

(৪) "দাদার" যথা ইচ্ছা তথা বিচরণ—মাধুদের শোবার ঘরে দাদার সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশ। ভোর তখন পাঁচটা, মাধু তখন সবে মাত্র উঠেছে মাধুর স্বামীও উঠবেন উঠবেন কোরছেন তখনও বিছানায়, এমন সময় দেখতে পেলেন "দাদা" ঘরের মেঝে থেকে হঠাৎ এসে আবির্ভাব হোলেন ওদের সামনে। ওরা এত অভিভূত হয়ে গেলো যে চীৎকার করতে আরম্ভ করলো। ডাঃ মৈত্র তো "দাদা" "দাদা" বলে চীৎকার—ঘরের দরজা বন্ধ কি করে দাদা ঘরে ঢুকলেন ?

ডাঃ মানস মৈত্রের মা ছেলের চীৎকার শুনে দৌড়ে ছুটে এলেন ও জানতে চাইলেন কি হয়েছে। ডাঃ মৈত্র তখন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন বাইরের সদর দরজা কিম্বা গেট খোলা আছে কিনা—তিনি জানালেন এখনও কোন দরজার তালাও খোলা হয় নাই। তখন সবাই বুঝতে পারলে "দাদা" কি ভাবে এসেছেন ! যথা ইচ্ছা তথা গমন "দাদার" পক্ষে নুতন তো কিছু নয়।

"দাদা" মাধুদের ওখানে সকালে চা খেয়ে সেদিনকার মতন বিদায় নিলেন। সেই দিনই আমার "দাদার" সাথে দেখা হয়েছিল—তিনি বল্লেন "জানিস মাধুদিদির খুব ইচ্ছা হয়েছিল ঐ সময় আমাকে ওদের শোবার ঘরে দেখতে পায়। তাই ওদের ইচ্ছাই পূরণ কোরলাম।"

মাধু আরও বলেছে, রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে যা কথা বলে, অনেক সময় "দাদা" নাকি অক্ষরে অক্ষরে বলে দেন—দাদা নাকি বলেন "আমি তো তোদের সাথেই শুয়ে থাকি রে।"

আবার মাধুর মুখে শুনেছি একদিন ওরা গাড়ী করে যাচ্ছিল পেট্রোল নেওয়া দরকার—দাদাও ওদের সাথে আছেন—মানসবাবু টাকার ব্যাগ নিতে ভুলে গেছেন—পেট্রোল নেবার কি করবেন ভাবছেন

এমনি সময় দেখলেন—"দাদা" হাত বাড়িয়ে দিলেন—হাতে এসে উদয় হোল একখানি দশ টাকার নোট।

জগতে কিছুই অসম্ভব নয়, ভগবানই দেহ ধরে ভক্তদের নিয়ে লীলা করেন।

আমাদের ছোট্ট রমা—

রমা মুখার্জী গোমেশ লেনে থাকে। সরলতার প্রতিমূর্তি আমাদের দাদার স্নেহের প্রার্থী। দাদার কাছে কি করে আসবে সেজন্যে সব সময়ই উন্মুখ হয়ে থাকে, "দাদাও" রমার মনের তীব্র ইচ্ছা অনুভব করে তাঁর যোগমায়া বলে ইচ্ছামতন রমাকে কাছে নিয়ে আসেন সে অতি অপার্থিব যোগাযোগ—

(১) রমা বোলছিলো দাদার কাছে সব সময়ই আসতে তার ইচ্ছা করে, কিন্তু রমা বনেদী ঘরের মেয়ে, সেই জন্যে বাইরে বের হবার বাধা আছে। কেউ সাথে না এলে কখনই রাস্তায় একা চলা ফেরা করে না।

একদিন "দাদা" ফোন করছেন শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজাতে রমাকে যোগ দেবার জন্যে—রমার বাবা ফোন ধরেছিলেন—তিনি "দাদাকে" বল্লেন "তার শরীর ভাল নেই, কে রমাকে নিয়ে যাবে! তাই আজ আর রমার যাওয়া হবেনা।" রমার মন খুবই খারাপ—বেলা ২ টার সময় সে ঠাকুর ঘরে পূজা করতে গিয়েছে, হঠাৎ দেখে ঠাকুরের সিংহাসনের নীচের থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। একটু পরে সে দেখে "দাদার" মুখ, "দাদা" যেন ওকে বলছেন "রমা আয় আমার সাথে পূজা দেখতে যাবি আয়।" রমা বল্লে "তার পর আমি কিছুই জানিনা আমি যেন আছন্নের মতন হয়ে গেলাম।" বেলা পাঁচটার সময় দেখি ডাঃ অনিল মৈত্রের বাসায় রয়েছি আমি—গায়ে আমার লাল ফুল ভয়েলের ব্লাউজ, পরণে পেঁয়াজী রঙএর জরি পাড় শাড়ী—এ শাড়ী

কোথা থেকে এলো কে দিলো কিছুই আমি বলতে পারবো না শুধু বলতে পারি এ শাড়ী ব্লাউজ আমার নয়।

(২) সকাল থেকে রমাকে পাওয়া যাচ্ছে না—ভোর পাঁচটাতে রমার বাবা উঠে যখন বাথরুমে যান, তখন দেখেন রমা তার মায়ের সাথে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। বাথরুম থেকে ফিরে এসে রমাকে উপরে আর দেখতে না পেয়ে নীচে গেলেন খুঁজতে খুঁজতে। যেয়ে দেখেন কোলাপসেবল গেটের তালা বাইরে থেকে লাগানো রয়েছে—কি ব্যাপার তালা তো ভেতর থেকেই লাগানো ছিল—চাবি খুঁজলেন চাবি কোথাও দেখতে পেলেন না—রমা কি তাহলে তালা বাইরে থেকে লাগিয়ে গেলো নাকি? কি করবেন দাদাকে ফোন করবেন নাকি এই সব ভাবছেন। এমন সময় খবরের কাগজওয়ালা এসে সিঁড়ির ওপর ওপর গেটের ফাঁক দিয়ে কাগজ দিয়ে গেলো। রমার বাবা কাগজটা তুলে নিতেই দেখেন তার নীচে রয়েছে তালার চাবি। আরে! 'একটু আগেও যে তিনি চাবি খুঁজে গেছেন এখানে, ছিল না তো চাবি! এই সব ভাবতে ভাবতে উপরে এসে সিগারেট জ্বালাবেন বলে ম্যাচ বাক্স খুলে দেখেন তার মধ্যে একটা তুলসী পাতা রয়েছে। তুলসী পাতা দেখে অবাক—এই সময় উপরে ফোন বেজে উঠলো—ফোন ধরতেই "দাদার" গলার আওয়াজ পেলেন। দাদা বল্‌ছেন "তুমি চিন্তা কোর না, রমা আমার কাছে আছে। তুলসী পাতা পেয়েছ তো? আমি গিয়েছিলাম তুলসী পাতা রেখে দিয়ে আমার যাবার প্রমাণ রেখে এসেছি—না হলে তোমরা বুঝবে কি করে?"

এ কি ব্যাপার মানুষের বিশ্লেষণ করা সাধ্যের বাইরে—এ সব "দাদার খেলা দাদাই" জানেন—আমরা উপলক্ষ্যমাত্র।

রমার দাদা ডাক্তার তিনি নিজে এসে বিভূতিদাকে সব বলে গেছেন।

রমা কিভাবে আস্‌ছে সেটা রমারও বোধশক্তির বাইরে। দু'দিনই নূতন শাড়ী ও ব্লাউজ কোথা থেকে এলো সে নিজেও জানেন না।

"দাদা বলেন—'ইহাও সম্ভব'।

দাদার মঞ্জু—

আমাদের মঞ্জু চক্রবর্তী, ছোট্ট নিরীহ শান্ত ও ভাল মানুষ। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে নি। "দাদাই" মঞ্জুর মনে এনে দিয়েছেন শক্তি ও অসীম নির্ভরতা। "দাদা" অন্ত প্রাণ মঞ্জুর। মায়ের স্নেহ, গোপাল রূপেই সে দাদাকে দেখে, অন্তরে পায় গোপাল ভাবে—"গোপাল মা" মঞ্জু। পূর্ণ বিশ্বাস তার "দাদার" পরে—ভালমন্দ সে কিছুই জানেনা, শুধু জানে "দাদাকে"। "দাদাও" মঞ্জু বলতে অস্থির। মঞ্জুর আঘাত "দাদা" বুক পেতে নিজের দেহে গ্রহণ করেন। মঞ্জু অতি প্রিয় "তাঁর—প্রিয় সন্তান, প্রিয় সখী, মীরাবাঈ মঞ্জু—ভক্তিতে পরিপূর্ণ। মঞ্জুর কণ্ঠের গান অপূর্ব ভাবে ও ভক্তিতে ভরা। যে শুনেছে সেই জানে; ভক্তের প্রাণের মূর্চ্ছনা—
সেই মঞ্জুর কাছে শুনেছি!—

"মঞ্জু"—রেফ্রিজিটার খুলতে যেয়ে একবার খুব জোরে ইলেকট্রিকের শক্ খায় ও শরীর খুব খারাপ বোধ করতে থাকে। প্রথমে কেউই বুঝতে পারেনি যে মঞ্জু শক্ খেয়েছে। সেই সময় দাদা মঞ্জুর বাড়ীতে ফোন করে বল্‌লেন—"তাঁর" শরীরও অত্যন্ত খারাপ—ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে। যেটুকু শক্ মঞ্জুর লেগেছে তারচেয়ে অনেক বেশী শক্ "তাঁর দেহে" এসে লেগেছে। মঞ্জুর বাড়ীতে যখন "দাদা" এলেন, তখন সবাই দেখলে "দাদার" চেহারা খুবই খারাপ, শারীরিক কষ্ট হচ্ছে "তাঁর"। একটু পরেই দাদা চলে গেলেন, কিন্তু বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি এই শক্ নিজের দেহে ধারণ না করলে জীবনের আশঙ্কা ছিলো মঞ্জুর। ভক্তের কষ্ট ও বিপদ নিজের পরেই টেনে নিলেন। ভক্ত

বৎসল তিনি, স্নেহময় "তিনি"। পরে রেফ্রিজিটার কোম্পানী থেকে এসে মেসিনটা পরীক্ষা করে দেখে জানায় যে ফ্রীজের শক্ প্রুফ মেসিনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে, সেই জন্যেই এই বিপদ ঘটেছে।

নবরূপে মঞ্জুর দাদাকে দর্শন—

প্রতি শনিবার মঞ্জুর বাড়ীতে "দাদা" পূজায় বসেন। শনিবার বিকাল ৫টার সময় দাদা মঞ্জুর বোসবার—ঘরে বড় সোফাটার পরে বসে আছেন,—আর মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করছেন—"কিরে আমাকে কেমন দেখ্‌ছিস্।" সে এক ছেলে মানুষী চেহারা দাদার—কথা শুনে মনে হয় বাচ্চা ছেলে—দাদার সে ভাব অপরূপ। মঞ্জু বল্‌ছে, "গোপালের মতন দেখ্‌ছি, জয়দেবের মতন দেখছি, আপনার মতন দেখছি—কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গিয়েছে, মঞ্জু দাদার সাথে কথা বলছে—হঠাৎ দেখলে দেয়ালে "দাদার" দু'টি ছায়া পড়েছে—তার মধ্যে একটি ছায়ার রঙ হালকা নীল—কি আশ্চর্য্য দু'টি ছায়া কেন? আর ঘরে তো নীল রঙের লাইটের বালবও নেই—তবে নীল রঙ এর ছায়া কোথা থেকে এলো "দাদার"। মঞ্জু তখনও অত গভীর ভাবে চিন্তা করেনি।

একটু বাদেই "দাদা" পূজার ঘরে চলে গেলেন। পূজা শেষে আবার এই ঘরে এসে বসে যখন চা খাচ্ছেন, তখন মঞ্জুর নজরে পড়ে দেওয়ালে "দাদার" ছায়ার দিকে। "কই দু'টি ছায়া তো দেখা যাচ্ছে না "দাদার" একটিমাত্র ছায়া পড়েছে দেয়ালের গায়ে। হালকা নীল রঙ এর দ্বিতীয় ছায়াটা তো নেই? তখন বুঝতে পরে "দাদার" লীলা খেলা, "দাদার" স্নেহের খেলা—পরম ভক্তকে, পরম প্রিয়কে জানিয়ে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন।

"আমিই নীল নব ঘনশ্যাম" তোমাদের সাথে সাথেই রয়েছি—যুগ যুগান্তরের আমি "সেই"—অনন্ত মহান রূপে তোমাদের "দাদা" তোমাদের মাঝেই, ভক্তমনে প্রাণে, একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে বর্তমান।

মঞ্জুর অবস্থা তখন বর্ণনার অতীত। আয়ত চোখ দুটি দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়েছে।

বৌদির দর্শন—

শ্রীমতি আলো রায় চৌধুরী "দাদার" আদর্শ সহধর্মিনী, অতি শান্ত স্বভাব, 'দাদার' শক্তির অংশ। জাগতিক জীবনে দাদার দুঃখ কষ্টের সমান অধিকারী। সত্যি কথা বলতে গেলে কি 'দাদার' থেকে বৌদিকেই ভোগ করতে হয়—দুঃখ কষ্টের ভাগটা বেশী—কারণ দাদা তো মহাভাবে আছন্ন থাকেন, সর্বদাই তন্ময়—'তাঁর' তো জাগতিক জীবনের দুঃখ কষ্টের বোধই নাই। সংসারে থাকতে গেলে আর্থিক প্রয়োজন আছেই, সেটা দাদার খেয়ালের বাইরে। তিনি গুরু গিরি করেন না বা তার কোন আশ্রমও নেই যে আশ্রম চলে ভক্তদের দানে। নিজের ধর্ম জীবনের সাথে ছোট্ট একটু কর্ম জীবন আছে দাদার—তাতেই তাঁর সংসার কোন রকমে চলে। দাদা কারো কাছ থেকে একটি পয়সাও গ্রহণ করেন না—কেউ কিছু দিতে গেলে বলেন "খবরদার আমাকে টাকা পয়সা দিলে তোদের সব জ্বলে যাবে।" মাড়োয়ারী মহলে "দাদাকে" অনেক সময়ই শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজায় বসতে যেতে হয়, এমন কি বিড়লাদের বাড়ী। ওদের তো টাকার অভাব নেই। ওরা 'দাদাকে' টাকা দিয়ে প্রণাম কোরবার জন্যে অস্থির, সে টাকার অঙ্কও বেশ মোটা—কিন্তু 'দাদার' সেই একই কথা—আমাকে টাকা বা কোন বস্তু দিয়ে প্রণাম করলে তোমাদের সব জ্বলে যাবে।" পয়সা নেওয়ার কথা দূরে থাক, শ্রীসত্যনারায়ণ পূজা অন্তে—চা ও বিস্কুট, কিংম্বা অল্প স্বল্প কাঁচা ছানা ছাড়া কোন প্রকার খাদ্যই গ্রহণ করেন না।

আইভি ও অভিজিৎ 'দাদার' ছেলে ও মেয়ে। আইভি দেখতেও যেমন মিষ্টি, স্বভাও তেমনি মিষ্টি, অভি (অভিজিৎ) ছোট্ট ছেলে ৯।১০ বছরের—প্রাণ চঞ্চল, চলার দুরন্ত গতিতে উদ্দাম। বৌদিকে সামলাতে হয় সব রকম দায়িত্ব সন্তানদের।

বৌদির কাছে শুনেছি প্রথম দিকে 'দাদাকে' তিনি নিজেও চিনতে বা বুঝতে পারেন নি। সব সময় ভাবস্থ, অপ্রকৃতস্থ 'দাদাকে' মনে করতেন মদে মাতাল হয়ে আছেন। কিন্তু ভগবৎ প্রেমের মদ যে তিনি সেটা বুঝতে পারেন নি। এই ভগবানের প্রেমের মদে মাতালের মতন মত্ত অবস্থা, তাঁর স্বরূপ মহাভাবে এসে নিজেই বুঝিয়ে দিলেন বৌদিকে।

বৌদি একদিন দেখলেন, দোতালার পূজার ঘরে দাদা বসে আছেন ধ্যানমগ্ন হয়ে তাঁর আসনে, একটু পরেই তিনি নীচে নেমে এলেন। নীচে নেমে বৌদি দেখেন 'দাদা' তার বাড়ীর বাইরের বারান্দায় পায়চারী করছেন। বৌদি ভাবলেন কি ব্যাপার এক্ষুনি তো দেখে এলাম ওঁকে পূজার ঘরে, আবার উপরে উঠে যেয়ে দেখেন দাদা ঠিক সেই ভাবেই বসে আছেন পূজার আসনে। বৌদির মনে তখনও সংশয় ভাবলেন মনের ভুলে দেখেছেন 'দাদাকে' নীচে।

পাশের বাড়ীতে বৌদির বাবা, মা থাকেন, ওখানে যাবেন বলে বৌদি নীচে নেমে ঐ বাড়ীতে গেলেন—সেখানে গিয়ে দেখেন 'দাদা' বসে কথা বলছেন, বৌদির মা, বাবার সাথে। বৌদির মনে তখনও সন্দেহের দোলা—ভাবছেন ভুল দেখছি নাকি আবারও। দৌড়ে বাড়ী এসে দোতলায় উঠে দেখেন, দাদা ঠিক সেই ভাবেই বসে আছেন—তখন বৌদি 'দাদার' কাছে লুটিয়ে পড়ে মার্জনা ভিক্ষা করেন তাঁর অপরাধের জন্যে।

একইরূপে একই দেহে বিভিন্ন ভাবে দাদাকে সব জায়গায় দেখা যায়। দু'ই বাড়ীতে 'দাদা' এক সাথে সত্যনারায়ণ পূজা করছেন এ তো সর্বদাই জানা যাচ্ছে। এক বাড়ীতে স্বয়ং 'তিনি' পূজা করছেন, আর এক বাড়ীতে স্বয়ং দাদা পূজা করছেন। একই পরিবেশ—সেই স্বর্গীয় পরিবেশ, ধূপের ধোঁয়ায় ও সুগন্ধে পরিপূর্ণ বাড়ীর সব ঘর দোর আসবাব পত্র। এর নিগূঢ় তত্ত্ব স্বয়ং তিনিই জানেন।

(৫) বৌদির ঠাকুর দর্শন—খুব ভোরে গৌরবর্ণ, ফুটফুটে, খালি

গায়—চিবুকে স্বল্প দাড়ি—এমনি চেহারার একটি সাধু পুরুষ লোক 'দাদার' বাড়ীর সামনে দাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন "এ বাড়ীতে একজন মহাযোগী পুরুষ থাকেন শুনেছি তিনি কই? দেখা হবে?" বৌদি তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছেন তিনি বল্লেন "উনি তো এখনও পূজার ঘরে আছেন, ৭টার আগে তো বের হন না।"

এদিকে দাদা তো পূজার আসনে থেকেই বুঝতে পেরেছেন শ্রীশ্রী রামঠাকুর, শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ এসেছেন তাঁকে পরীক্ষা করতে, তাঁকে ছলনা করতে। পড়ি, কি মরি করে দৌড়ে তিনি নীচে নেমে এসেছেন। নীচে এসেই দু'জনা দু'জনের দিকে তাঁকিয়ে হেসে জড়িয়ে ধরেছেন—একে অন্যকে।

ঠাকুর দাদাকে বলছেন, "আমাকে কিছু খাওয়া নারে।"—দাদা বলছেন "তুমি আবার কি খাবে? তোমার কি আর খাবার জায়গা আছে পেটে? আচ্ছা একটু চিনি জল খাও।"—আইভি এসে তখন ওখানে দাঁড়িয়েছে—দাদা ওকে চিনি জল আনতে বল্লেন, আইভি চিনি জল করে ঠাকুরের হাতে দিলো—তিনি চিনির সরবৎ টুকু পান করে—আইভির ইংরাজী নাম শুনে ঠাট্টা তামাসা করলেন।

এর পর 'দাদাকে' ঠাকুর করুণ কণ্ঠে বল্লেন, আমায় একটা কম্বল দিবি?

দাদা বল্লেন, একটা কেন লাখ্‌টা কম্বল তোমায় দেবো—তবে একটা শর্তে—যতক্ষণ লক্ষ কম্বল না আসবে ততক্ষণ তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে বুঝলে? বলেই দাদা যেই হাত তুলেছেন, অমনি 'ঠাকুর' হাত ধরে নামিয়ে দিয়ে হেসে ফেল্লেন, বল্লেন দরকার নেই। ঠাকুর এর পরে 'দাদাকে' প্রণাম করতে চাইলে দাদা আত্মস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন, আমি কেন আপত্তি করবো, বেশ তো করনা কেন—নিজেকেই তো নিজে প্রমাম করবে, আমি কে?

তারপর ঠাকুর বিদায় নিলেন। বারান্দার কোলাপসেবল গেটের

ওধারে যেয়ে কোথায় যে অন্তর্ধান করলেন কেউ আর দেখতে পেলনা। বৌদিতো আছন্নের মতন, অতিভূতের মতন বারান্দায় বসে পড়লেন। একটু বেলাতে মাধু এলে বল্লেন 'তোমরা তো কত কিছুই দর্শন করো, আজ সত্যিই আমি এমন একজন—জ্যোতির্ময় পুরুষের দর্শন পেলাম—আনি ধন্য। এতেই আমার বহুদর্শন হয়ে গেলো।'

ধন্য বৌদি, তুমি যার কৃপা পেয়েছ জাগতিক জীবনে তিনি তোমার স্বামী হলেও তিনি সবারই আরাধ্য। দ্বাপরে তুমিই তারই পাশে স্থান পেয়েছিলে, সত্যভামা, রুক্মিনী রূপে। তুমি আমাদের অতি শ্রদ্ধার ও সম্মানের পাত্রী বৌদি। যুগে যুগে কত ভাবেই আমাদের মধ্যে আসছেন ভগবান।

যুগে যুগে প্রভু এস হে ধরায়
করিতে আলোর চেতন দান
অন্তর উদাসে প্রাণের পরশে
লীলাময় শ্যাম ভগবান।

অনেকেই হয়তো দাদার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন ও অনেক কিছু পেয়েছেন 'দাদার' কাছ থেকে আমি সব কিছু জানিনা বলে লিখতে অক্ষম। মার্জনা ভিক্ষা করছি।

———

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

আমার প্রার্থনা

দাদা ভাই—কল্যাণময় তুমি, স্নেহময় তুমি!

তোমাকে পেয়েছি, তোমাকে দেখেছি, তেমাকে জেনেছি কতরূপে তোমাকে দেখেছি ভাবের অভিব্যক্তিতে। সেরূপ তো আমি মনের মতন করে বোঝাতে পারছিনা, জানাতে পারছিনা,—আমার মনের গভীর আবেগ মনেই থেকে যাচ্ছে।

'তোমার সে অনন্ত রূপ, তোমার সে অনন্ত মায়া, ভাষায় মূর্ত কোরবার আমার সাধ্য নেই—তোমার মায়া দিয়ে, তোমার প্রেম দিয়ে তোমার জ্যোতি দিয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছ "দাদা ভাই আমার"।

"দাদা ভাই", তোমার কাছে এই মিনতি, উজ্বল জ্যোতিতে যে হৃদয় একবার ভরে দিয়েছ তাকে সরিয়ে দিওনা, নিভিয়ে দিওনা। আরতো তোমার কাছে কিছু চাইনি—চাইনি, মান যশ, প্রতিপত্তি—চাইনি সুখ শান্তি,—শুধু চাইছি দাও আমার অন্তরে উপলব্ধির অনুভূতির আলো—যে আলোতে আমার মন প্রাণ আনন্দ শিহরণে পুলকিত হয়ে উঠবে। অন্তর উঠবে জেগে,—অন্তর্মুখী আনন্দ অশ্রুধারায়, অশ্রুসজল চোখের দৃষ্টি অন্তরে যেয়েই পরিসমাপ্তি হবে—শেষ হবে।

দাদা ভাই! তোমার জ্যেতির্ময় রূপের জ্যোতির আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক সবার হৃদয়—তোমার ভেতর দিয়ে সবাই যেন অন্তরের অন্তরতমকে জেনে নিতে পারে, চিনে নিতে পারে, বুঝে নিতে পারে। তোমার অলৌকিকের রূপের মায়ায় যেন, মুগ্ধ না হয়ে পড়ি প্রভু! দু'দিনের খেলায় ভুলে কি হবে। অন্তরে তোমার চির রূপের খেলায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকি, মগ্ন হয়ে থাকি,—সেই তোমার পায়ে একমাত্র প্রার্থনা—চির নবীন তুমি, চির সজীব তুমি। চির আশ্রয় তুমি।

মন আমার গভীর আবেগে—উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, সেই আবেগ

প্রকাশের ভাষা আমার জানা নাই—শুধু জানি। "তুমি আছ"! "তুমি আছ"।—সর্বময় রূপে তুমি আছ—বিশ্বজগৎব্যাপী তুমি আছ—দেহের প্রতিটি রক্ত বিন্দুতে, অণু পরমাণুতে তুমি ব্যাপ্ত—বিরাট বিশ্বরূপ তোমার,—সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে—পরম ব্রহ্মরূপে বিরাজমান।

মানুষ, আমরা বড় দুর্বল। কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি কই—মন যে বার বারই নীচে নেমে আসতে চায় জাগতিক জীবনের চাহিদায়। হিংসা, দ্বেষ, মান, অভিমান সব নিয়েই জড়িয়ে পড়ে আছি আমরা। সংশয় ভরা মন সব সময়ই অবিশ্বাসের সংশয়ে আচ্ছন্ন। আমাদের তুমি ক্ষমা কোরো "দাদা"! ভালবাসার গভীরে আমাদের নিয়ে যাও—তোমার স্নেহ ভালবাসার আলোই "তাঁর" কাছে পৌঁছে দেবার পথ দেখাবে—তোমরাই আলোর জ্যোতির আশীর্বাদে।

সমাধিস্থ ও ভাবস্থ অবস্থায়, তোমার উচ্চারিত শ্লোক বাণী ও তার অপূর্ব ব্যাখ্যা অপূর্ব ভাবের ব্যঞ্জনা ঊর্ধ্বলোকের সুরের তারে পৌঁছে দেয় সবার মনে প্রাণে। কিন্তু সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় তুমি বলতে পার না কখন কি বলেছো—তুমি বলো আবার তিনি দিলেই বলতে পারবো, ব্যখ্যা করতে পারবো।" 'দাদা কে সেই জন' জানাও আমাদের বোঝাও আমাদের। আর দাও পরিপূর্ণ বিশ্বাস।

বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে মস্তবড় একটা গণ্ডীটানা আছে,—সে গণ্ডী পেরিয়ে আশা বড় সহজ কথা নয়। চাই পরিপূর্ণ বিশ্বাস, অবিশ্বাসের ছোঁয়াচ যেন তাতে একটুও এসে না লাগে। পরিপূর্ণ বিশ্বাসের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যায় চরম উপলব্ধির অনুভূতি। মনতো আমাদের সংশয়ের দোলায় সব সময়ই দুলছে আর ভেবেই চলেছে—এ ভাবনার শেষ কোথায় কেউ জানে না।

"দাদা ভাই" তোমার সংস্পর্শে এসে যেন মনের সব বদ্ধ দুয়ার খুলে যায়—আলোয় আলোয় ভরে যায় অন্তর ও বাহির,—সেখানে যেন না থাকে কোন অবিশ্বাসের ছোঁওয়া, আসে শুধু পূর্ণ বিশ্বাস।

দাদাভাই, কবে সে অন্তরের উপলব্ধির চরম সীমায় পৌঁছাতে পারবো জানিনা, যা পাবার আশায় অন্তর আমার কেঁদে কেঁদে ফেরে। আমি কি পাবো সেই উপলব্ধি ? আমি কি পাবো তাঁকে ? অন্তরঙ্গ ভাবে তোমারই মাঝে খুঁজে ফিরছি তাঁকে। অন্তরের তরঙ্গদোলায়, তোমার সাথে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে পারি, পরম জীবন সত্তার পরম উপলব্ধির মাঝে—যেখানে নাই কোন ভয়, নাই কোন চাওয়া পাওয়া, নাই কোন মান অভিমান, শুধু আছে পরম ভালবাসা ও পূর্ণ বিশ্বাস। তোমার অন্তর তরঙ্গদোলায় দুলে দুলে আমি যেন ভেসে যেতে পারি। একই স্রোতে তাঁকে পাবার নেশায়।

দাদা! তোমার কথা, তোমার বাণী, তোমার আত্মসমাহিত ভাব নিয়ে যায় কোন ঊর্ধ্বলোকে যার ঠিকানা আমার জানা নাই—মনে বিরাজ করে পূর্ণ শান্তিময় পরম তৃপ্তি—তোমায় দেখি আলোর শিখার মতন জ্বলছো, হৃদয়ের গভীর অনির্বাণ উজ্বল জ্যোতিতে—বিকীর্ণ হয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে হৃদয়ের দিগ দিগন্তে।

দাদা ভাই মাঝে মাঝে তোমার অসহিষ্ণু উক্তি "আঃ আমি কাউকে কিছু বোঝাতে পারছিনা—কেউ বুঝতে পারছেনা—আমি অসহায়।"

দাদা গো! যে বুঝবার সে ঠিকই বুঝে নেবে। তুমি তোমার বাণী শুধু বলে যাও, দিয়ে যাও, ছড়িয়ে দাও কাছের ও দূরের সবারই মধ্যে। তোমার স্নেহময় বাণী ও স্নেহের স্পর্শে;—আত্মচেতনা এনে দেবেই দেবে সবার মধ্যে। তোমার ওপর পূর্ণ বিশ্বাসই সহজ ও সরল করে দেবে তাঁর কাছে যাবার পথ।

তোমার ভালবাসার জ্যোতির আলোতে আমরা যেন আমাদের পথ চিনে নিতে পারি।—অনুভূতির উপলব্ধিতে যেন নিজের আত্মায় মগ্ন হতে পারি—সেই আশীর্বাদই করো তুমি আমাদের "দাদা"।

তোমার পায়েই আশ্রয় নিলাম—।

তোমার স্নেহের ছোট বোন রেণুকা।

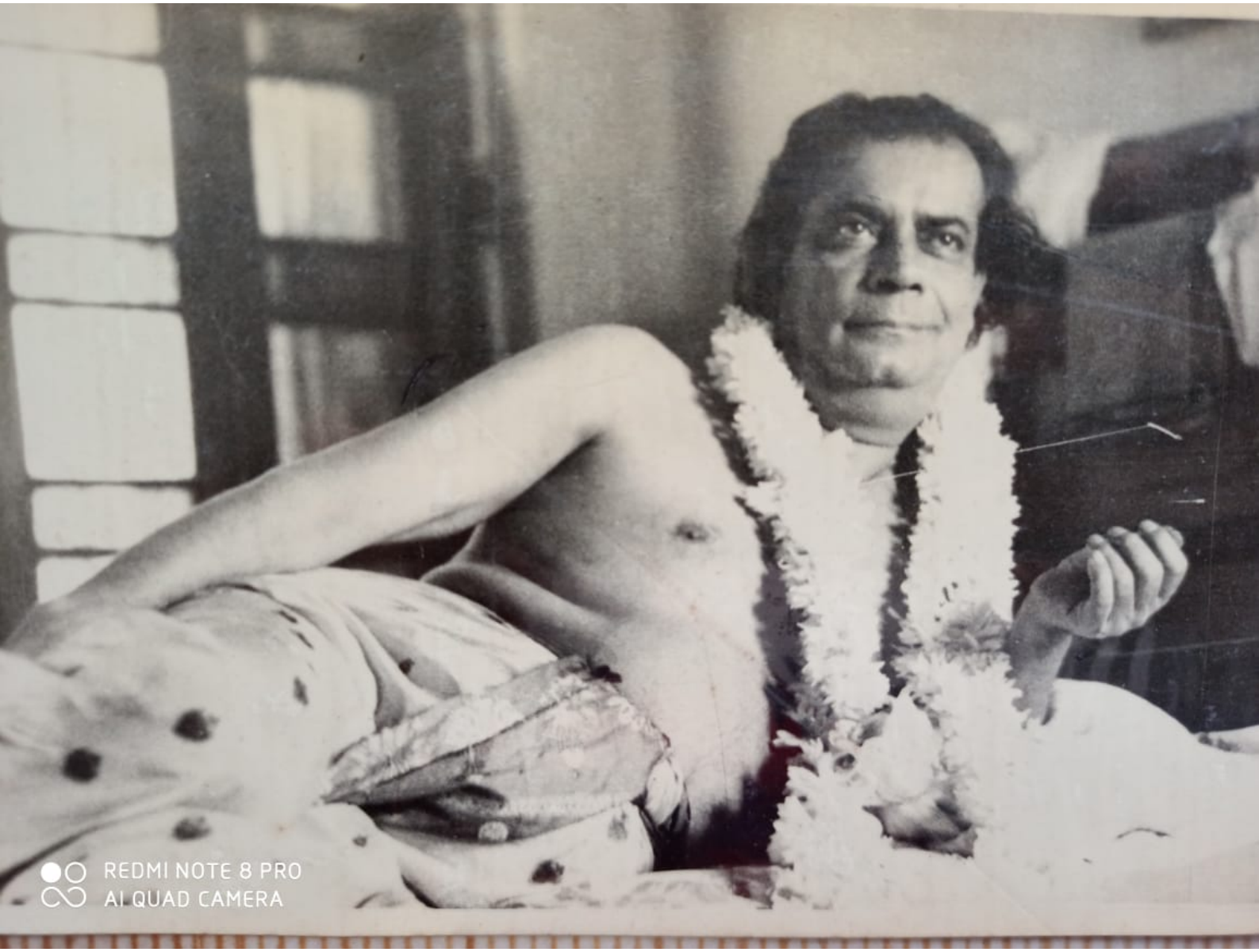
REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA